হাঙ্গার লকেটের রহস্য

শ্রীস্বপনকুমার

আই. ডি. সিরিজ—৮নং

হীরার লকেটের রহস্য

শ্রীস্বপনকুমার

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)]
কলিকাতা-৭০০ ০০১

মুদ্রণ]

মূল্য ঃ তিন টাকা

প্রকাশক ঃ
"রাজেন্দ্র লাইব্রেরী"
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড,
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)]
কলিকাতা-৭০০ ০০১

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত
"মা তারা প্রিন্টিং প্রেস"
৪৬, পার্বতী ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

এজেন্ট ঃ
জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রেস
১৩৩, রাসবিহারী বসু রোড (ক্যানিং স্ট্রীট)
কলিকাতা-৭০০ ০০১

বাংলা-সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক,
রহস্য ও রোমাঞ্চ-সাহিত্যের যাদুকর
শ্রীস্বপনকুমার রচিত

সি. আই. ডি. সিরিজ

১। ছত্রপতির তলোয়ার
২। অপরাধী সম্রাট
৩। দস্যুরাজের ষড়যন্ত্র
৪। প্রাণ নিয়ে খেলা
৫। মিস্ট্রি গার্ল
৬। আঁধার রাতের যাত্রী
৭। গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাব
৮। হীরার লকেটের রহস্য
৯। অজানা পার্শেলের রহস্য
১০। নীল সাগরের আতংক

[এর পরে আরও বের হচ্ছে]

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

॥ এক ॥

সকাল সাতটা।

রোজকার মতই খ্যাতনামা প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী তার ড্রইংরুমে বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজটা পড়ছিল।

এমন সময় একটা খবর তার চোখে পড়ল।

আবার কোলকাতার বুকে দস্যু বীরভদ্র।

পর পর দুটো দোকান লুণ্ঠন। এক ধনীর বিশহাজার টাকা নিয়ে উধাও।

এর পরে অনেকটা জায়গা জুড়ে অতীতের ভয়াবহ দস্যু বীরভদ্রের নানা কাহিনী ছাপা হয়েছে। এই দুর্ধর্ষ দস্যু আবার এসেছে কোলকাতায়। অবিলম্বে তাকে ধরার জন্যে পুলিশ বাহিনীর সক্রিয় হওয়া উচিত।

তার ভয়ে কোলকাতার ধনীরা তটস্থ। পাঁচ ছ' বছর আগে সে মাত্র তিনমাসে কোলকাতাকে সন্ত্রাসে পূর্ণ করে তুলেছিল, আবার তেমনি সুরু করেছে।

তাকে ধরবার উপযুক্ত পুলিশ তথা গোয়েন্দা কোলকাতা শহরে যারা আছেন—তারা যেন জনসাধারণের এই উপকার করেন। ইত্যাদি।

কাগজ পড়া শেষ হলে রতনকে ডাকল দীপক।

রতন এলো এ-ঘরে।

দীপক বললে—আজকের কাগজ পড়েছিস ?

—না।

—এই দেখ।

রতনও পড়ল খবটা।

বললে—তাহলে ত শিগ্‌গীরই ঝামেলা সুরু হবে মনে হচ্ছে।

—তা হবে।

—একাজ হাতে নিতেই হবে—বিশেষ করে মিঃ সেন যদি বলেন—

—তা ঠিক।

—তাহলে অন্য ছোটখাট কাজগুলো সব কমিয়ে রাখি। কি বলিস ?

দীপক চিন্তিতভাবে বললে—হুঁ।

—পুলিশ থেকে না ডাকলে ত তুই বোধ হয় এ কেসে হাত দিবি না ?

—না।

—তবে ঠিক আছে। দেখা যাক্ কতদূর কি হয়।

এমন সময় চাকর ভজুয়া এসে ডাকল—বাবু!

—কি খবর রে ?

—একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

—কিরকম দেখতে।

—বাঙালী লোক। বেশ ধনী মনে হয়।

—বেশ, নিয়ে আয়।

একটা কার্ডও দিয়েছিলেন তিনি।

—কই দেখি।

দীপক দেখল কার্ডে লেখা :

ধীরেন মল্লিক

জুয়েলার্স এণ্ড ব্যাঙ্কার্স।

১২৩ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

দীপক বললে—আরে, ইনি ত বিখ্যাত ধনীলোক। তা হঠাৎ আমার কাছে কেন ?

—জানি না ত।

—আচ্ছা, পাঠিয়ে দে শিগ্‌গীর।

ভজুয়া বেরিয়ে গেল। একটু পরেই দামী আদ্দির পাঞ্জাবী আর তাঁতের ধুতি পরে ঢুকলেন এক ভদ্রলোক। সোনার বোতাম, আংটি, দামী ঘড়ি হাতে।

দীপক ভাল করে তাকাল।

মাঝারী আকারের ভদ্রলোক। বয়স প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে।

চেহারা সুশ্রী। মুখে একটা অভিজাত্যের ছাপ।

—বসুন স্যার।

দীপক ধীরকণ্ঠে বললে কথাটা।

মিঃ মল্লিক বসলেন।

—আমি বিশেষ কারণে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি মিঃ চ্যাটার্জী।

—বলুন ?

—আমি শুনেছি আপনি সারাভারতের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ। সারা বিশ্বে আপনি বিখ্যাত।

—তা হতে পারে।

দীপক বললে লজ্জিতভাবে।

—আমি তাই এসেছি বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য চাইতে আপনার কাজের উপরে আমার বিরাট শ্রদ্ধা।

—বলুন ?

—বোধহয় জানেন আমি ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হীরা-ব্যবসায়ী।

—শুনেছি।

—বড় বড় ধনীদের দামী হীরা জহরৎ আমার কাছে থাকে।

—তাও জানি।

—হঠাৎ পরশুদিন আমি এমন একটা চিঠি পেলাম যে তাতে কিছুটা। ভয় পেয়ে বাধ্য হয়েছি আপনার সাহায্য চাইতে।

—কি রকম?

—এই দেখুন চিঠিটা।

চিঠিটা দেখল দীপক। তা হলো কুখ্যাত দস্যু বীরভদ্রের লেখা। তাতে লেখা ছিল:

প্রিয় মিঃ মল্লিক!

বহুদিন ধরে বহু অর্থ আপনি উপার্জন করেছেন। আপনার তাই টাকার অভাব নেই।

আমি চাই, আপনার টাকার সামান্য একটা অংশ মাত্র আপনি দান করবেন আমাদের। মাত্র দশ হাজার টাকা দেবেন আমাকে।

এই সামান্য টাকা আপনি যে কোনও লোককে দিয়ে কাল সন্ধ্যা ছটার মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন শ্যামবাজারের মোড়ে দেশবন্ধু পার্কের স্ট্যাচুর নীচে।

আমি অপেক্ষা করব সেখানে। টাকাটা আমার হস্তগত হবে।

আর যদি তা না পাঠান তবে তিনদিনের দিন আপনার সঞ্চিত জুয়েলারী থেকে সবচেয়ে মহামূল্যবান সম্পদ অর্থাৎ বরোদার মহারাজার জন্য যে তিনলাখ টাকা মূল্যের বিরাট হীরার লকেটটি আপনি কিনেছিলেন, তা আমি অপহরণ করব।

পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগের ক্ষমতা নেই আমার কাজে বাধা দিতে পারে। আর যদি পুলিশে খবর দেন, তাহলে আমি আপনার টাকা গ্রহণ করব না। ঐ হীরার লকেটটি ঠিকই অপহরণ করব।

—বড় বড় ধনীদের দামী হীরা জহরৎ আমার কাছে থাকে।

—তাও জানি।

—হঠাৎ পরশুদিন আমি এমন একটা চিঠি পেলাম যে তাতে কিছুটা। ভয় পেয়ে বাধ্য হয়েছি আপনার সাহায্য চাইতে।

—কি রকম?

—এই দেখুন চিঠিটা।

চিঠিটা দেখল দীপক। তা হলো কুখ্যাত দস্যু বীরভদ্রের লেখা। তাতে লেখা ছিল:

প্রিয় মিঃ মল্লিক!

বহুদিন ধরে বহু অর্থ আপনি উপার্জন করেছেন। আপনার তাই টাকার অভাব নেই।

আমি চাই, আপনার টাকার সামান্য একটা অংশ মাত্র আপনি দান করবেন আমাদের। মাত্র দশ হাজার টাকা দেবেন আমাকে।

এই সামান্য টাকা আপনি যে কোনও লোককে দিয়ে কাল সন্ধ্যা ছটার মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন শ্যামবাজারের মোড়ে দেশবন্ধু পার্কের স্ট্যাচুর নীচে।

আমি অপেক্ষা করব সেখানে। টাকাটা আমার হস্তগত হবে।

আর যদি তা না পাঠান তবে তিনদিনের দিন আপনার সঞ্চিত জুয়েলারী থেকে সবচেয়ে মহামূল্যবান সম্পদ অর্থাৎ বরোদার মহারাজার জন্য যে তিনলাখ টাকা মূল্যের বিরাট হীরার লকেটটি আপনি কিনেছিলেন, তা আমি অপহরণ করব।

পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগের ক্ষমতা নেই আমার কাজে বাধা দিতে পারে। আর যদি পুলিশে খবর দেন, তাহলে আমি আপনার টাকা গ্রহণ করব না। ঐ হীরার লকেটটি ঠিকই অপহরণ করব।

আমার কাজে বাধা দেবার মত ক্ষমতা ঐ পুলিশ বিভাগের নেই। আশা করি, ভেবে দেখবেন সব কথা। ইতি—

বীরভদ্র।

দীপক চিঠিটা পড়ে বললে—কে এই বীরভদ্র তা কি জানেন মিঃ মল্লিক ?

—না। তবে সম্প্রতি কাগজে এই নামটা পড়েছি বলে যেন মনে হচ্ছে।

—ঠিক। লোকটা একজন নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল। সারা ভারত জুড়ে তার কাজ চলে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ঘুরে বেড়ায় ছদ্মবেশে। পুলিশ বিভাগ শত চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারেনি!

—এখন কি করা যায় বলুন ত ?

—আপনি পুলিশকে কি জানিয়েছেন ?

—না, ভয়ে জানাইনি। সোজা গোপনে চলে এসেছি আপনার কাছে।

দীপক হাসল।

মিঃ মল্লিক বললেন—আপনি হাসলেন যে ?

—হাসছি এই জন্যে যে, পুলিশকে না জানালেও গোপনে আপনি যে আমার কাছে এসেছেন তা ওরা জানে।

—তার মানে ?

—মানে আপনাকে ফলো করে ওদের লোক আমার বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করে ঠিক চলে এসেছে।

—সে কি কথা ?

—হ্যাঁ ঐ দেখুন বড় রাস্তায় যে ছোট চায়ের দোকানটা আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন পাজামা আর পাঞ্জাবী পরা ছোকরা বার-বার আমার বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

—তাই ত।

—ও শত্রুদের চর বলেই আমার সন্দেহ হয়।

—সর্বনাশ। তাহলে উপায় ?

—উপায় একটিই আছে। পুলিশের সাহায্য নেওয়া। কারণ শিকারী শিকারের উপরে নজর রাখবেই। এটা তাদের কর্তব্য।

—তা ঠিক। তাহলে পুলিশকে কি আমি জানাব ?

—জানাতে পারেন। তবে আপাততঃ তাতে কতটা লাভ হবে তা আমি বলতে পারি না।

মিঃ মল্লিক যেন ভেঙে পড়লেন। বললেন—সর্বনাশ হবে আমার ঐ দামী হীরার লকেটটা চুরি গেলে—

—ওটা কিসের লকেট ?

—ওর একটা বিরাট ইতিহাস আছে মিঃ চ্যাটার্জী। ঐ লকেটটি নাকি ছিল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের গলায়। তাঁর মৃত্যুর পর সেটি চুরি যায়। একজন খোজা প্রহরী সেটা নিয়ে পালিয়ে যায় আফ্রিকায়। সেখানে তাকে খুন করে একজন কাফ্রী সেটা নিয়ে নেয়।

ঐ লকেটটি যেন অভিশপ্ত। যখন যার হাতে থাকে, তখনই তার মৃত্যু হতো বা সে আহত হতো। নানা হাত ঘুরতে ঘুরতে সেটা যায় ইংলণ্ডে। একজন ধনী ব্যারণ ওটা কেনেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সব সম্পত্তি নীলামে বিক্রি হয়। বরোদার মহারাজার নির্দেশে আমি ওটা নীলামে কিনে নেই। সেই থেকে ওটা আমার কাছেই আছে। প্রায় দু'মাস ওটা আছে। তিনি নিজে কোলকাতায় এলে ওটা ডেলিভারী নেবেন। এ কাজে আমার প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকার মত লাভ হবে, কিন্তু ওটা চুরি গেলে ত সর্বনাশ হবে আমার।

—তাহলে ওটা ব্যাঙ্কের সেফ্ ভোল্টে রাখেননি কেন ?

—আমি ত আগে ধারণা করতেই পারিনি যে এমন ঘটনা ঘটবে।

—তা বটে।

—আর এখন তা রাখতে গেলে পথের মধ্যে সহজেই দস্যুরা অপহরণ করতে পারে। তার চেয়ে বাড়িতেই ওটা নিরাপদে আছে।

—সে কথা ঠিকই।

দীপক চিন্তিত হয়।

॥ দুই ॥

দীপক কোনও উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ ঘন ঘন বেজে উঠল টেলিফোনটা।

দীপক রিসিভারটা তুলল।

—হ্যালো···কে? বললে দীপক।

—হ্যাঁ, আমি মিঃ সেন কথা বলছি। বিশেষ জরুরী দরকার আপনার সঙ্গে।

—বলুন?

—আপনি কি এখন বাড়িতে আছেন?

—তা আছি।

—ঠিক আছে। আমি তাহলে এক্ষুণি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছি।

—ভাল কথা। কিন্তু আপনি কি দস্যু বীরভদ্র সম্পর্কে কথা বলতে চান ?

—আশ্চর্য। কি করে জানলেন ?

—জানা কঠিন নয়। কারণ বর্তমানে তার জন্যে যে আপনার খুব বদনাম হচ্ছে তা আমি আন্দাজ করতে পারছি।

—ঠিক বলেছেন মশাই। উঃ, ওকে কিছুতেই আমরা নিরস্ত করতে পারছি না। অথচ উপর থেকে হরদম চাপ আসছে আমাদের উপরে।

—তা ত আন্দাজ করেই কথাটা বললাম। শুনুন, আর একটা ঘটনা সম্প্রতি ঘটতে চলেছে। তারও মূলে ঐ বীরভদ্র।

—কি ব্যাপার ?

দীপক তখন সংক্ষেপে মিঃ মল্লিক ও হীরার লকেট সংক্রান্ত সব ঘটনা বললে।

তা শুনে মিঃ সেন বললেন—উনি কি এখন আপনার বাড়িতেই আছেন নাকি ?

—হাঁ।

—বেশ ত, আমি আসছি এক্ষুনি। সব কথা হবে। কি বলেন ?

—ঠিক আছে।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

তারপর মিঃ মল্লিককে বললে—আপনি একটু বসুন। এক্ষুণি কোলকাতা পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার মিঃ সেন আসছেন দেখা করতে। তিনিই ওই বীরভদ্র কেস নিয়ে কাজ করছেন।

—বেশ, আমি বসছি।

মিঃ মল্লিক বসে রইলেন চুপ করে।

* * *

আধঘণ্টা পরে :

সিঁড়িতে শোনা গেল ভারী বুটের শব্দ।

মিঃ সেন ঘরে ঢুকলেন।

দীপক ভজুয়াকে চা ও খাবার আনতে বললে। তারপর মিঃ সেনকে বললে—আপনি এক মিনিট বসুন, আমি আসছি।

—কোথেকে ?

—মনে হয় বীরভদ্রের একজন অনুচর আমার বাড়ির উপরে নজর রেখেছে। তাকে আমি ধরতে চাই।

দীপক ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। দরজা জানলা বন্ধ করে ছদ্মবেশে সজ্জিত হলো। তাকে দেখাচ্ছিল ঠিক একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের মত।

তারপর বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিপথে এলো সেই দোকানটার সামনে।

আচম্‌কা পিস্তল উদ্যত করে ধরল সে ঐ লোকটার দিকে।

লোকটা ত হতভম্ব।

বললে—কে আপনি ?

—একটি কথাও না বলে আমার আগে আগে চলে এসো চাঁদ। না হলে গুলি মেরে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেবো।

—কে আপনি ?

—ভেতরে গেলেই টের পাবে।

দীপক লোকটাকে নিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে ঢুকল। যে ঘরে মিঃ সেন আর মিঃ মল্লিক বসেছিলেন সেই ঘরে।

মিঃ সেন তাকে দেখেই চিনতে পারলেন। বললেন—আরে, এত হলো টপ্‌কাবাজ পাঁচু।

মিঃ মল্লিক বললেন—টপ্‌কাবাজ কাকে বলে স্যার ?

—ঐ যারা সোনার বাটের লোভ দেখিয়ে টাকা চীট্ করে।

—বুঝেছি।

—তা পাঁচু, তুমি হঠাৎ এখানে ?

—আমি এখন কোনও ক্রাইম্ করি না স্যার। একজন লোকের অধীনে কাজ করি।

—কে সেই মহাত্মা ?

—তাকে দেখা যায় না। শুধু চিঠিতে তার হুকুম পাওয়া যায়। আর কাজ করলে ঠিকমত টাকা পাওয়া যায়। কোনও অসুবিধে নেই।

—তুমি দীপকবাবুর বাড়ির উপরে নজর রেখেছিলে কি তারই হুকুমে ?

—হ্যাঁ স্যর।

—দেখি সে হুকুমনামাটা কেমন ?

পাঁচু একটা চিঠি বের করে দিলো। তাতে লেখা :

পাঁচু,

তুমি আজ সকাল সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ধীরেন মল্লিকের উপরে নজর রাখবে। সে যখন যেখানে যাবে, তুমিও যাবে। রাত দশটায় চিৎপুরের হোটেলে খবর দেবে একজন লোককে—তার পরণে থাকবে কালো কোট, সাদা প্যাণ্ট। তাকে সব খবর জানালে তোমার প্রাপ্য একশো টাকা পাবে। ইতি—

বীরভদ্র।

মিঃ সেন বললেন—কে এই বীরভদ্র ?

—তা দলের কেউ জানতে পারে না। আমরা তো ছোটখাট চুনোপুঁটি, যারা দলের মাথা তারাও জানতে পারে না।

—বুঝেছি।

দীপক চিন্তিত হলো।

মিঃ সেন বললেন—ঠিক আছে, আমি একে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। দেখা যাক, ও মুখ খোলে কি না।

—ঠিক আছে। তবে ওর আর বেশি বলার ক্ষমতা নেই।

মিঃ সেন একটু ভেবে বললেন—তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম কি?

—পরশু দিন মিঃ মল্লিকের বাড়ি গার্ড দিতে হবে। যদি বীরভদ্র সেখানে যায়, তাকে ধরতেই হবে সেখানে।

—সে ত নিশ্চয়ই।

—আর আপনিও খুব সাবধানে থাকবেন মিঃ মল্লিক। অচেনা কোনও লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না যেন।

—আচ্ছা স্যার।

—দেখা যাক্, এবার বীরভদ্র ফাঁদে পা দেয় কি না। তবে মনে হয় সে আসবে না।

মিঃ সেন লোকটির হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে চললেন থানায়।

সঙ্গে চললেন মিঃ মল্লিক। রতনকেও দীপক সঙ্গে পাঠাল সশস্ত্র অবস্থায় লালবাজার পর্যন্ত মিঃ সেনকে পৌঁছে দেবার জন্যে।

* * *

সেদিন বিকেলে।

দীপক একটা টেলিফোন পেল হঠাৎ।

—কে কথা বলছেন?

—আমি বীরভদ্র কথা বলছি।

লোকটা বাংলায় কথা বললেও তার মধ্যে যেন একটা বিদেশী টান লক্ষ্য করল দীপক। ভাবল, লোকটা হয়ত ইচ্ছা করেই ঐভাবে কথা বলছে?

দীপক বললে—কি চাই?

—আমার দলের একজন চুনোপুঁটিকে গ্রেপ্তার করেছেন বলে নিজেকে খুব ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করবেন না। আমার কাজে বাধা দেবার ক্ষমতা আপনাদের নেই, একথা মনে রাখবেন।

—বেশ ত, রাখবো।

—আর আপনি যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন তাহলে আপনার জীবনও বিপন্ন হবে তা আগেই সাবধান করে রাখছি।

—তা জানি। কিন্তু অত সহজে আমি ভয় পাই না তাও তুমি জেনে রেখো।

—বেশ ত, ঘটনাস্থলে দেখা যাবে বুদ্ধির লড়াইতে কার মাথা বেশী।

—ঠিক আছে।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল বিরক্তি সহকারে। তারপর মন দিল অন্য কাজে।

দীপক ভাবল, বীরভদ্রের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে মিঃ মল্লিকের বাড়িতে তার আগে এ বিষয়ে বেশী মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

॥ তিন ॥

নির্দিষ্ট দিনে।

সকাল থেকেই মিঃ সেনের পুলিশ বাহিনী বেশ ভালভাবে মিঃ মল্লিকের বাড়ি পাহারা দিতে সুরু করে দিল।

মিঃ মল্লিক সেদিন বাড়ি থেকে একবারও বের হলেন না।

মিঃ সেন আর দীপকও ঠিক বিকেল চারটেতে এসে উপস্থিত হলো।

সারা বাড়িটা যেন পুলিশের একটা ব্যূহ বলে মনে হতে লাগল।

দীপক মিঃ মল্লিককে বললেন—আচ্ছা, ঐ হীরার লকেটটা কোন ঘরে আছে?

—এই ঘরেই—কোণের ঐ ষ্টীলের আলমারীতে।

—ঠিক আছে।

দীপক বললে—মিঃ সেন, আপনি দুজন আর্মড সঙ্গী নিয়ে এখানে বসুন। আর আমি বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে ছদ্মবেশে নজর রাখছি। কারণ কোনও লোক কৌশলে ঢুকবার বা বের হবার চেষ্টা করলে তাদের বাধা দিতে হবে।

মিঃ সেন বললেন—ঠিক আছে।

দীপক পাশের ঘরে গিয়ে ছদ্মবেশ পরে নিল। তারপর বাড়ির পেছন দিকের দরজা দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল।

মিঃ সেন তখন মিঃ মল্লিককে বললেন—আপনি ইচ্ছা করলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারেন।

মিঃ মল্লিক বললেন—এই চিন্তিত মন নিয়ে ঘুমানো যায় না স্যার!

—তা বটে।

মিঃ মল্লিক চুপ করে বসে রইলেন।

সময় কেটে চলল।

রাত ন'টা বাজল ঢং ঢং করে। এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল ঝন্ ঝন্ করে।

মিঃ মল্লিক ফোন তুললেন।

—হ্যালো···কে?

—আমি বীরভদ্র কথা বলছি। আপনার চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করেছি মিঃ মল্লিক। ঠিক আজ রাতের মধ্যেই—

বলে আর কিছু বললে না সে। টেলিফোন-সংযোগ কেটে গেল।

মিঃ মল্লিক সব কথা বললেন মিঃ সেনকে।

শুনে মিঃ সেন হাসলেন।

বললেন—অত সহজ ব্যাপার এটা নয় মিঃ মল্লিক। কেউ এলে সে ধরা পড়তে বাধ্য।

—আমারও ত তাই ধারণা ছিল স্যার।

—মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছে—অথচ আসতে সাহস পাচ্ছে না।

—তা বটে।

মিঃ সেনের মাথায় নানা চিন্তা খেলা করতে থাকে ?

* * *

আরো মিনিট পনেরো পর।

ঘস্ ঘস্···

শোনা গেল মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল মিঃ মল্লিকের বাড়ির ঠিক সামনে।

একজন কনেষ্টবল এসে মিঃ সেনকে বললে—স্বয়ং পুলিশ কমিশনার এসেছেন কাজ তদারক করতে।

মিঃ সেন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—তাঁকে নিয়ে এসো ভেতরে।

একটু পরেই পুলিশ কমিশনার ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে দু'জন সহকারী।

তাঁকে দেখে মিঃ সেন বললেন—আসুন স্যার। আমরা ঠিকমত কাজ করছি।

—ধন্যবাদ।

পুলিশ কমিশনার আর কিছু না বলে হঠাৎ কি একটা কৌটা বের করে বললেন—দস্যু বীরভদ্রকে বাধা দেবার ক্ষমতা এ বিশ্বের কারও নেই।

বলেই সে হাত থেকে ডিমের মত কি একটা পদার্থ মেঝেতে ফেলে দিল।

দুম্—

প্রচণ্ড শব্দ হলো একটা।

সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়ি যেন কেঁপে উঠল।

একটা বিষাক্ত গ্যাস বের হলো। মিঃ সেন আর তাঁর দলবল অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

এদিকে সিন্দুকের উপরেও কি একটা চূর্ণ ছিটিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে সে।

সঙ্গে সঙ্গে লোহাটা যেন গলে গেল। সিন্দুকের মাঝে দেখা দিল একটা ফোকর।

সেই ফোকরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল বীরভদ্র।

একটা বাক্স বের করল।

বাক্সের মধ্যে ছিল একটা হীরার লকেট।

বীরভদ্র সেটা পকেটে পুরে দ্রুতগতিতে নীচে নেমে এলো।

পুলিশ ছুটে এলো।

পুলিশ কমিশনারবেশী বীরভদ্র বললে—শীঘ্র উপরে যাও তোমরা। ডাকু আয়া হ্যায়—

তারা উপরে ছুটে গেল।

পুলিশ কমিশনারবেশী বীরভদ্র একটা গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি দ্রুত ছুটে চলল।

কিন্তু সবার চোখে ধুলো দিলেও একজনকে ফাঁকি দিতে পারল না বীরভদ্র।

সে হলো ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী।

দীপক একটু দূরে বসেছিল। সে পুলিশ কমিশনারকে হঠাৎ দৌড়ে চলে যেতে সন্দেহ করল।

তার গাড়িটা লুকানো ছিল একটু দূরে।

পুলিশ কমিশনারবেশী বীরভদ্র চলতে সুরু করতেই দীপক তাকে অনুসরণ করল।

* * *

অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে দুটি গাড়ি ছুটে চলল।

দীপক সাবধানে ছিল।

সে চায় না যে আগের গাড়ির আরোহী বুঝতে পারুক যে, সে তাকে অনুসরণ করছে।

দীপক গাড়ি ছুটিয়ে দিল বেশ কিছুটা ব্যবধান রেখে। যাতে আগের গাড়ির আরোহী তাকে সন্দেহ করতে না পারে।

॥ চার ॥

পুলিশ কমিশনারের গাড়িটা যখন লালবাজারের দিকে না গিয়ে দক্ষিণ কোলকাতার পথ ধরল, তখন দীপকের সন্দেহ দৃঢ় হলো।

সে বুঝলে পারল যে নিশ্চয়ই কোনও একটা বিরাট গোলমাল আছে এর মধ্যে।

পুলিশ কমিশনার কখনোই যে দক্ষিণ কোলকাতার দিকে গাড়ি ছোটাতে পারেন না, তা দীপকের মত এত অভিজ্ঞ গোয়েন্দার না জানার কথা নয়।

গাড়ি ছুটল বালিগঞ্জ পেরিয়ে।

দীপকও ঠিকমত দূর থেকে অনুসরণ করে চলল।

বালিগঞ্জ পেরিয়ে টালিগঞ্জ।

আরও দক্ষিণে—

রিজেণ্ট পার্ক পেরিয়ে চলল।

অবশেষে বহু সময় পরে জয়রামপুরের কাছে গিয়ে একটা পল্লী অঞ্চলের পোড়ো বাড়ীর সাম্‌নে এসে গাড়িটার গতি মন্থর হ'ল।

বহুদূর থেকে দীপক দেখল।

গাড়িটা ঘুরল ডানদিকে।

দীপকও গাড়ি থামালো।

পায়ে হেঁটে সে এগিয়ে চলল ডানদিকের পথটা ধরে।

কিছুক্ষণ কাটল।

একটা পোড়ো বাড়ির সাম্‌নে এসে দীপক দেখল যে একটা বাঁশ-ঝাড়ের পেছনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা সাম্‌নের পোড়ো বাড়িতেই প্রবেশ করেছে বলে দীপক অনুমান করল।

চলল সে পেছনে পেছনে।

আরও এগিয়ে দেখে যে সত্যিই পোড়ো বাড়িতে একটা ঘরে আলো জ্বলছে।

দীপক আর এগোল না।

সে ফিরে চলল তার গাড়ির দিকে। গাড়িতে এসে উঠল দীপক।

তারপর ফিরে চলল মোড়ের বাজারের দিকে।

জয়রামপুর বাজার।

একটা ডাক্তারখানা খোলা দেখতে পেল দীপক।

সে ভেতরে প্রবেশ করে বললে—এখানে টেলিফোন আছে?

—কে আপনি?

—আমি পুলিশের লোক।

—কি চাই?

—একটা ফোন করবো।

—বেশ ত, করুন।

দীপক ফোন করল লালবাজারে।

একটু পরেই সে পেল মিঃ সেনের পরিচিত সেই কণ্ঠস্বর।

—হ্যালো···কে ?

—আমি দীপক কথা বলছি।

—কোত্থেকে ?

—জয়রামপুর বাজার থেকে। আপনি এক্ষুনি চলে আসুন এখানে।

—ঠিক আছে। কি ব্যাপার ?

— বীরভদ্র।

—ও-কে।

রিসিভার নামাল দীপক। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

আধঘণ্টা পরে।

হঠাৎ শোনা গেল কয়েকটি মোটরগাড়ির শব্দ।

দীপক উৎকর্ণ হলো। এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

দেখে, মিঃ সেন সদলে এসেছেন।

—কি ব্যাপার ?

—সামনে চলুন।

—কোথায় ?

—দেখতেই পাবেন—আসুন।

সকলে এগিয়ে গেল। পোড়ো বাড়িটা ঘিরে ফেলা হলো।

দু'চারবার চলল গুলি-বিনিময়। তারপর আত্মসমর্পণ করল বীরভদ্র।

ভেতরে প্রবেশ করল এদের দলবল।

বীরভদ্র বললে—কি চাই ?

মুখে তার মুখোস। হাতে সেই হীরার লকেট।

—ওটা চাই।

বলে, লকেটটা ছিনিয়ে নিলেন মিঃ সেন।

বললেন—শয়তান, তোমাকে এবার ধরেছি।

—ধরেছ ?

—হ্যাঁ।

—মিথ্যা কথা। হাঃ হাঃ হাঃ···

অট্টহাসি হেসে উঠল বীরভদ্র।

—ধরবে আমাকে ?

—নিশ্চয়।

—তবে ধর।

বীরভদ্র হঠাৎ একটা লাফ দিল।

তারপর মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল একটা মহা-পরিবর্তন।

বীরভদ্রের পায়ের চাপে একটা সুইচ যেন নড়ে উঠল।

নিমেষে দেখা গেল, বিরাট একটা সুড়ঙ্গপথ।

সেই সুড়ঙ্গপথে বীরভদ্র মুহূর্তে যেন ওপর থেকে নিচে নেমে গেল।

দীপক পিস্তল তুলল। গুলি করল।

গুড়ুম! গুড়ুম!

কিন্তু গুলি লাগল না।

বীরভদ্র নিমেষে নেমে গেল সেই সুড়ঙ্গপথে।

যেন পাতালে তলিয়ে গেল সে হঠাৎ।

দীপক ছুটে গিয়ে দেখে, বীরভদ্র অদৃশ্য হয়ে গেছে। চীৎকার করে উঠল—চলুন। এই পথেই চলুন—

সদলে দীপক ও মিঃ সেন সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করল।

কিন্তু সব অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ একটা শব্দ হলো—ঘটাং—

দীপক দেখে, সুড়ঙ্গপথ বন্ধ।

দস্যু বীরভদ্র অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দীপক বললে—উঃ, একটা মুহূর্তের জন্যে সব হারালাম!

—তা বটে। বললেন মিঃ সেন খেদের সঙ্গে।

দস্যু বীরভদ্রকে ধরা গেল না। তবে সে নবরূপে আবার আবির্ভূত হলো দীপকের জীবনে।

॥ পাঁচ ॥

এর কিছুদিন পরের কথা। এমন একটা ঘটনা ঘটল দীপকের জীবনে যে, সেটা যেমন অভিনব তেমনি রহস্যময়।

দীপকের নিজের ডায়েরী থেকেই সে ঘটনাটা এখানে লেখা হচ্ছে।

ট্রেন ছাড়তে তখনও মিনিট পাঁচেক দেরী ছিল।

প্রথম হুইসিল পড়ে গিয়েছে এবং গার্ড মহাশয়ের অপেক্ষায় দ্বিতীয় হুইসিল ও চাকা নড়তে প্রস্তুত ছিল। এমন সময় ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে কামরায় প্রবেশ করল এক দম্পতি।

দম্পতি বলেই আমার মনে হয়।

সঙ্গে এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা। সম্ভবত, এদের আয়া এবং সবার শেষে এক কুলীর মাথায় সদ্য দোকান থেকে কিনে আনা হোল্ডল, সুটকেশ ইত্যাদি।

কামরাটা প্রথম শ্রেণীর, তাই একেবারে ফাঁকা ছিল। যাত্রী বলতে কেবল আমি—ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী। তাই আগন্তুকদের কিছু অসুবিধে হলো না।

কুলীটা ভাড়া চাইতেই তাকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বিদায় করল সেই অ্যাংলো ভদ্রমহিলাটি। কুলীটার সাথে আশ্চর্য হলাম আমিও।

যাই হোক, কুলীটা নেমে গেল। আমি জানতাম আমাদের কম্পার্টমেন্টের নম্বর ৯৯। ভাবলাম আজ এই অদ্ভুত নম্বরের কামরায় কোনও অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে না ত? ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

আমার পুরোনো চাকর শ্যামলাল পাশের সার্ভেন্ট কামরায় আছে। যাবার আগে পরিপাটি করে বিছানা করে, ফ্লাস্কে গরম চা ভরে, মাথার কাছে নতুন কয়েকটি মাসিক পত্রিকা রেখে সে গেছে।

এইসব করবার জন্যেই সে ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টাখানেক আগে ষ্টেশনে আসতে ভালবাসে। প্রভুর জন্য সে বোধহয় খুবই গর্বিত। কারণ কামরার বাইরে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী লেখা যে ছোট কার্ডটি টাঙানো থাকে সেটাও নাকি সে ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে যেতে ভোলে না।

আমার হাতে একটা মাসিক পত্রিকা ছিল। তাকে আড়াল করে আমি আগন্তুকদের দেখে যেতে লাগলাম এবং সেটা বই পড়ার অপেক্ষা কম আকর্ষণীয় বলে মনে হলো না।

প্রথম দৃষ্টিতেই যেটা নজর পড়ার যোগ্য ছিল সেটা হলো—রূপ। মহিলাটিকে দেখে কালিদাসের শকুন্তলার কথা আমার মনে হলো। আমি মনে মনে ওকে শকুন্তলা, ভদ্রলোকটিকে দুষ্মন্ত এবং অ্যাংলো মহিলাকে গৌতমী বলে আখ্যা দিলাম।

গাড়ি ছেড়ে দেবার পর ওদের দৃষ্টি পড়ল আমার ওপরে। কিন্তু আমার অখণ্ড মনোযোগ মাসিক পত্রিকাটিতে। ওরা নিজেদের মধ্যে একত্র হলো।

শকুন্তলা একবার তার গভীর চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করলো আমার দিকে।

তারপরে দুষ্মন্তের গা ঘেঁষে পরিষ্কার পাঞ্জাবী-ভাষায় বললে—পিতম্, টিকিট না কেটে উঠে তো পড়লাম, কিছু হবে না ?

—হবে আর কি ! কিছু জরিমানা লাগবে। গৌতমীর জবাব।

আমি কান খাড়া করে থাকলাম।

রক্তিম মুখে হাসি ফুটিয়ে শকুন্তলা বললে—পিতম্, তোমার বাড়িতে বোধহয় এতক্ষণে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেছে।

দুষ্মন্ত ওরফে পিতম্ জানালার বাইরে চেয়েছিল, শকুন্তলার কথার উত্তরে সে মৃদুকণ্ঠে কি জবাব দিল শুনতে পেলাম না।

গৌতমী তীক্ষ্ণকণ্ঠে ইংরেজিতে বললে—উই হ্যাভ লাকি টু ডু। পূওর ফাদার এণ্ড আংকল্।

শকুন্তলা ইসারায় আমাকে দেখাল।

দিল্লী থেকে কোলকাতায় চলেছি।

বিশেষ একটা জরুরী কাজে সরকারী অতিথি হয়েছিলাম কয়েকদিন ওখানে।

দিল্লীর কাজ ফুরিয়েছে। এখন বাকি যেটুকু আছে সেটা কোলকাতায় আশা করছি ঘটবে তার সমাধি। দিল্লী পুলিশের বড় সাহেব হরিনারায়ণ প্রসাদ প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সঙ্গে দিয়েছেন। দরকার পড়লে ফোনে কথা বলে নেব। ওনার সঙ্গে এমন ব্যবস্থাও আছে।

শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের কথাবার্তা যতটুকু শুনলাম, মনে হলো, ওরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

কিন্তু কে নিয়ে এসেছে কাকে সেটা বুঝলাম না। কারণ যতদূর দেখেছি ও শুনেছি, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে নিয়ে আসেনি। আর এই অ্যাংলো বুড়িটাই বা কে ?

জিয়াদাবাদ ষ্টেশনে এসে ট্রেন থামল। গৌতমী-বুড়ি ষ্টেশনে নেমে পড়ল। আমিও ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে নেমে পড়লাম।

দরজার কাছেই একজন চেকারের সঙ্গে দেখা হলো। শুনলাম গৌতমী বুড়ি বলছে, কোলকাতায় এক মরণাপন্ন আত্মীয়ের খবর পেয়ে শেষ মুহূর্তে তারা ট্রেনে উঠেছে টিকিট না কেটে। এর জন্যে যত টাকা লাগে তারা দিতে প্রস্তুত।

চেকার ভদ্রলোক টাকার কথা বললেন এবং টিকিট কেটে দিতে দিতে আরোহীদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

—ও মিষ্টার! দেয়ার দি ওন্‌লি সন্ এণ্ড ডটার-ইন্-ল অফ মিষ্টার রবীন্দ্রনাথ কাপুর অফ দিল্লী। বুড়ি জবাব দিল।

চেকার প্রশ্ন করলেন—রবীন্দ্রনাথ কাপুর অফ কুতুব রোড?

ততক্ষণে বুড়ি আমাকে দেখেছে। আমাকে শুনিয়ে সে চেঁচিয়ে উত্তর করল—ইয়েস, দ্যাট্ ফেমাস ব্যাঙ্কার।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না।

আমার কি রকম মনে হলো যে, এরা যা বলছে সব সত্যি নয়। এর মধ্যে রহস্য আছে।

ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে দিল্লীতে হরিনারায়ণ প্রসাদের কাছে ফোন করে যখন এলাম, তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। সামনে একটি থার্ড ক্লাস পড়ল। উপায় না দেখে তাতে আমি উঠে পড়লাম।

প্রায় পৌণে একঘণ্টা বাদে পরের ষ্টেশন এল এবং আমি আমার কামরায় ফিরে এলাম।

কামরার সামনে দেখি গৌতমী এক অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলছে। আমাকে দেখে সরে গেল সেই ভদ্রলোক।

শ্যামলাল ভেতরে ছিল। টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে খাবার প্রস্তুত করছিল।

আমাকে দেখে বললে—এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি ভেবে ভেবে মরি। ডিনারের টাইম হয়ে এল।

শ্যামলালের ইংরেজি শুনে শকুন্তলা মুখ টিপে হাসল।

সুন্দর মুখের সমর্থন পেয়ে শ্যামলালের উৎসাহ বেড়ে গেল।

সে বলে চলল—ঠিকমত না খেলে বুঝি শরীর টিকবে? ডিটেকটিভ-গিরি—

'ডিটেকটিভ' কথাটা কানে যেতেই পিতম্ কাপুর আমার দিকে ভয়ার্ত চোখ মেলে তাকাল।

আমি শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের দিকে চেয়ে ইংরেজিতে বললাম—ইউ সি, ওল্ড সার্ভেন্টস্ আর্ অল্ওয়েজ মোর পাওয়ারফুল দ্যান মাদার এণ্ড ওয়াইফ।

আমার কথা শুনে ওরা দুজনেই হেসে উঠল।

আমি অর্ডার করলাম ওদের খাবার দিতে।

ওরা হেসে বললে—বয়কে আমাদের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। এর পরের বার আপনার থেকে খাব।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে থালা বাটি নিয়ে শ্যামলাল তৈরী হয়ে রইল এবং আলিগড় ষ্টেশনে সে নেমে পড়ল।

আমিও শুয়ে পড়লাম। বয় এসে খাবার দিয়ে গেল।

শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বড় আলো নিভে গেল।

জ্বলতে লাগল হাল্কা নীল আলো। আর জ্বলতে লাগল দু'ধারের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে এক একটা আলোর প্রহরী।

ট্রেন ছুটে চলল···

॥ ছয় ॥

ঘণ্টাখানেক বাদে আমার তন্দ্রা গেল কেটে।

আমি চোখ মেলে দেখলাম গৌতমী-বুড়ি শুয়ে পড়েছে। তার নাকের আওয়াজও মাঝে মাঝে আসছে।

আবছা অন্ধকারে কে একজন ওঠা-নামার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে!

উঠে পড়লাম। নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালাম তার পাশে।

আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত রাখলাম। চমকে সে ফিরে চাইল।

পিতম্ কাপুর।

—কি করছেন এখানে দাঁড়িয়ে? ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করলাম।

—কিছু না মিঃ চ্যাটার্জী। ঘুম আসছে না, তাই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

—মিঃ কাপুর!

দ্বিতীয়বার চমকে উঠল পিতম্ কাপুর।

—আপনি আমার নাম জানেন?

—শুধু আপনার নাম নয়, ধামও জানি। জবাব দিলাম আমি।

—কিন্তু কেন? আপনার কি প্রয়োজন? কেউ বুঝি আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে আপনাকে নিযুক্ত করেছে? হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন পিতম্ কাপুর।

—এসব আপনি কি বলছেন মিঃ কাপুর। একজন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রলোকের নাম জানলে সেটা কি খুব অপরাধ? আপনাদের আয়া ষ্টেশনে টিকিট-কালেকটারকে বলছিল, আমি কাছে ছিলাম শুনেছি।

পিতম্ কাপুর চুপ করে গেল।

আবছা আলোয় দেখলাম সারা মুখের ভেতর একটা যন্ত্রণার চিহ্ন।

—আপনি ভুল করছেন মিঃ চ্যাটার্জী। উনি আমাদের আয়া নন। আমার মাদার-ইন্-ল বিমলা—মানে, আমার স্ত্রীর মা।

স্ত্রীর মা অ্যাংলো মহিলা! তাও আবার বিখ্যাত শিল্পপতি রবীন্দ্রনাথ কাপুরের? মাননীয়া আত্মীয়ার এমন আচরণে বিস্মিত হলাম এবং দিল্লীতে হরিনারায়ণ প্রসাদকে ধন্যবাদ দিলাম।

পিতম্ কাপুর হঠাৎ আমার দু'হাত ধরে বললে—মিঃ চ্যাটার্জী, শুনলাম আপনি ডিটেকটিভ। আমার একটি উপকার করবেন?

—আপনাকে যদিও চিনি না, কিন্তু তবুও আপনাকে আমার ভাল লেগেছে এবং মনে হচ্ছে আপনি যেন মানসিক অশান্তিতে কষ্ট পাচ্ছেন। বলুন, আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব আমি আপনার উপকার করব।

গাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। এবং এই ঝাঁকুনিতে শকুন্তলার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন—পিতম্ এত রাতে ওখানে কি করছ? শোবে এস।

পিতম্ কাপুর ইসারায় আয়াকে মানা করে শকুন্তলার দিকে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি চলতে সুরু করল।

মিনিট পনেরো বাদে একটা জংশন ষ্টেশনে এসে গাড়ি থামলো।

রাত যদিও মন্দ হয়নি, তবুও লোক চলাচলের সংখ্যা কম ছিল না।

আমি দরজার দিকে পা বাড়ালাম। উদ্দেশ্য রেষ্টুরেণ্টে এক কাপ কফি খাওয়ার পর দিল্লীতে আর একটি ট্রাংকল করব।

সবে আমি ষ্টেশনে পা রেখেছি, এমন সময় পেছন থেকে ডেকে উঠল পিতম্ কাপুর—মিঃ চ্যাটার্জী, কাছাকাছি কোথাও চা পাওয়া যায়? গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

ইসারা বুঝলাম। চেঁচিয়ে বললাম—এত রাতে তো ফেরিওয়ালারা নেই। আসুন আমিও রেষ্টুরেন্টে কফি খেতে যাচ্ছি।

—এক মিনিট। বলে পিতম্ বিমলাকে কি যেন বলে একলাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে চলে এল।

এখানে কতক্ষণ গাড়ি থামবে?

হেসে বললাম—টাইম-টেবিলে তো লেখা আছে আধ ঘণ্টা, তবে ওদের অলিখিত টাইম অনুযায়ী কতক্ষণ থামবে, সেটা আমার জানা নেই।

দুজনের মধ্যে হাসি বিনিময় হলো।

কোণের দিকে একটা টেবিল বেছে নিয়ে দু'কাপ কফির অর্ডার দিয়ে বললাম—শীগগির চলুন মিঃ কাপুর, কারণ আমাদের হাতে তো আর বেশী সময় নেই।

একটু চুপ করে থেকে পিতম্ সুরু করল—শুনছেন বোধহয়, আমার পিতা শিল্পপতি। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের পরিশ্রমের বলে যিনি আজ শিল্পপতি হয়েছিলেন, বুঝতেই পারছেন তাঁর তেজ কতখানি। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান হলেও আমরও রেহাই ছিলনা।

বিমলার সাথে বছর পাঁচেক আগে আমার আলাপ হয় এক পার্টিতে।

প্রথম দর্শনে ওকে আমি ভালবেসে ফেললাম। ক্রমে পরিচয় গাঢ় হলো।

পরিচয় হলো ওর মা লিলি দেবীর সঙ্গে। আপনি ধারণা করতে পারবেন কিনা জানি না, আমি এরকম নিষ্ঠুর মহিলা জীবনে কখনো দেখিনি। এমন মহিলার মেয়ে যে বিমলা সেও আশ্চর্য।

বিমলার বাবা ছিলেন পাঞ্জাবী। কিন্তু মা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। পরে জানতে পারলাম তিনি যৌবনে বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

আর সত্য কথা বলতে কি, এখনও ওনার যথেষ্ট সুনাম বাজারে।

বাবার কানে উঠল কথাটা।

আমাকে ডেকে উনি বললেন—তোমার বিয়ে আমি অন্য জায়গায় ঠিক করে রেখেছি। আমার বন্ধুর মেয়ে। সে বন্ধু এককালে আমার বহু উপকার করেছে। তাকে আমি কথা দিয়েছি। যদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে আমি তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করব এবং সম্পত্তি সব কাকাকে দিয়ে দেব। আমার কাকা, বাবার বৈমাত্রেয় ভাই। ওনার স্বভাবটাও বিশেষ ভাল নয়!

বাবার শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না।

পাঁচদিন আগে উনি বললেন—তোমার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। কয়েকদিন সাবধানে থাকবে।

লিলি দেবী ক্ষেপে উঠলেন। বিমলা ভেঙে পড়ল।

উপায় না দেখে আমি আজ সকালবেলা রেজেস্ট্রী করে বিমলাকে বিয়ে করলাম! কারণ, বিমলাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি ঠিক করেছি কোলকাতায় যে বাড়ি আছে সেখানে বিমলাদের রেখে বিয়ের দিন পার করে আমি দিল্লীতে ফিরব এবং বাবাকে দেখাশুনা করব।

বাবা আর ক'দিনই বা আছেন। বাবার অবর্তমানে আমি বিমলাকে দিল্লীতে নিয়ে আসব। বিমলাও আমার এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছে।

কিন্তু আমার আসল মুস্কিল আরম্ভ হয়েছে, এরপর আমি জানতে পেরেছি, যৌবনে লিলি দেবীর বেশ কিছু টাকা বাবার একটি ব্যাঙ্কে ছিল এবং সে ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে ওনার ক্ষতি হয়েছিল। ক্ষতিপূরণ অবশ্য পেয়েছিলেন, কিন্তু ওনার মতে সে টাকা আমাদের কাছে কিছুই নয়।

তাই বাবার ওপর ওনার ভীষণ রাগ আছে। দ্বিতীয় বিপদ, উনি বলেছেন, বিমলা ওনার প্রথম স্বামীর মেয়ে।

আমি লুকিয়ে বিয়ে করেছি জানতে পারলে বাবা আমাকে ত্যজ্যপুত্র করতে পারেন মিঃ চ্যাটার্জী। আমি অন্যজাতের মেয়ে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছি জানলে উনি কি জানে বাঁচবেন ?

তাঁর এই দুর্বল শরীরে হার্টফেল অথবা আত্মহত্যা নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটবে। তাঁর চোখে আগে সম্মান, পরে অন্য কিছু।

লিলি দেবী বলেছেন, আমার বাবার কাছে উনি সব প্রকাশ করে দেবেন। তাতে যার যা ক্ষতি হয় হোক।

তবে আগ বাড়িয়ে বলবেন না। বাবা জিজ্ঞাসা করলে বলবেন।

এখন কথা হচ্ছে, কোলকাতায় অজ্ঞাতবাসের আগেই যদি ওনার সাথে বাবার হঠাৎ দেখা হয়ে যায় ? শেষে কি আমি পিতৃহত্যার কারণ হব ?

ঢং ঢং করে ট্রেনের ঘণ্টা বেজে উঠল। আমার ফোন করা হলো না। বললাম—মিষ্টার কাপুর, চলুন কামরায় ফিরে যাই। আমি একটু চিন্তা করে আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি।

জানালার কাছে উদ্বিগ্ন মুখে বসেছিলেন বিমলা দেবী। আমাদের দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

দেখলাম, লিলি দেবীও জেগে বসে আছেন।

একটু আগে শোনা কাহিনীটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। দেখা হলেই লিলি দেবী বলে দেবেন সব কথা।

—কেন ? এ কি ধরনের প্রতিহিংসা ? বিমলা মেয়েটাই বা কেমন ? কি করা উচিত ?

॥ সাত ॥

আমার ভাবনার সঙ্গে তাল দিয়ে তীব্রগতিতে ট্রেন ছুটে চলেছে।

কানে এল লিলি দেবী বলছেন—পিতম্ তোমার বাবা প্লেনে কোলকাতা রওনা হয়েছেন। আমরা কাল কোলকাতা পৌঁছবার আগেই উনি সেখানে পৌঁছে যাবেন। আমার মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন ষ্টেশনে তোমাকে হাতেনাতে ধরবার জন্যে। আমার ভয় হচ্ছে আমাকে আবার প্রশ্ন না করেন।

—মা, তুমি কি নিষ্ঠুর! তোমার কি আমার ওপর একটুও ভালবাসা নেই? বিমলা বলে উঠলেন।

—থামো, খুব হয়েছে। এতদিন ধরে এই দিনটিরই আমি প্রতীক্ষা করছিলাম। লিলি দেবীর নিষ্ঠুর জবাব!

আড়চোখে চেয়ে দেখলাম অন্ধকার হয়ে এসেছে পিতম্ কাপুরের মুখ।

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য আমি বললাম—যদি কিছু মনে না করেন, এক গ্লাস খাবার জল কি পাওয়া যাবে?

বিমলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। কুঁজো থেকে একগ্লাস জল গড়িয়ে দিলেন।

—আপনি জানলেন কি করে যে, বাবা প্লেনে আমাদের সঙ্গেই দিল্লী দৌড়চ্ছেন? পিতম্ প্রশ্ন করে লিলি দেবীকে।

আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোক এসেছেন এই ট্রেনে, তিনিই বললেন। লিলি দেবী জবাব দিলেন।

কথাটা বিশ্বাস করতে আমার একটু কষ্ট হলো।

রাত ন'টার গাড়িতে পালাচ্ছে একজন। বাড়িতে যখন জানা গেল, তখন আন্দাজ দশটা। প্লেনে যাবেন কিনা সেটা ঠিক হবে এর পর। তাই কি করে আগে থেকে মিসেস লিলি দেবীর আত্মীয় ভদ্রলোক জানলেন ?

দেখলাম, পিতম্ কাপুর বিশ্বাস করেছেন কথাটা।

হয়ত বাবার স্বভাব চেনেন বলেই। বিমলার মুখটা গম্ভীর। চোখ দুটি ছলছল করছে।

—আমি জানতে চাইছি, আপনি তাহলে সব কথা বলবেন ঠিক করেছেন ? ভয়ঙ্কর শোনাল পিতমের কণ্ঠস্বর।

—অফকোর্স। লিলি দেবী বললেন।

—যাক, এখনও রাত কিছুটা বাকী আছে, শুয়ে পড়া যাক।

লিলি দেবী শুয়ে পড়লেন।

বিমলা চোখ বন্ধ করে হেলান দিয়ে বসে।

পিতম্ জানালার বাইরে মেলে ধরলেন তাঁর চোখ দুটিকে।

কেবল আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন আসবে পরের ষ্টেশন। কখন ফোন করব, কেমন করে জানতে পারব লিলি দেবীর সেই পরিচিত ভদ্রলোকটি কে। তিনি কি মিঃ কাপুরের পরিচিত ?

* * *

গাড়ি ধীরে ধীরে একটা ষ্টেশনে ইন্ করল এবং আমি একলাফে নেমে পড়লাম ষ্টেশনে।

দিল্লীতে ট্রাঙ্কল করলাম।

হরিনারায়ণ প্রসাদ বললেন—আমি খোঁজ নিয়েছি মিঃ চ্যাটার্জী। রবীন্দ্রনাথ কাপুর আপনার সাথে একই ট্রেনে কোলকাতা চলেছেন।

আমাদের গোয়েন্দা খোঁজ নিয়েছে মিঃ কাপুরের নামে একটি টিকিট আজকের জন্য ইস্যু হয়েছে।

—আপনি ভুল করেননি তো হরিনারায়ণজী? মিঃ কাপুর তো রবীন্দ্রনাথ কাপুরের ছোট ভাইও হতে পারেন।

—ঠিক বলেছেন আপনি। আচ্ছা, আপনি আবার পরের ষ্টেশনে আমাকে ফোন করুন। এর মধ্যে আমি ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়ে রাখছি। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো মিঃ চ্যাটার্জী? এরা কোন কেসের সাথে যুক্ত নাকি?

—পরে বলব।

আমার নিজের কামরার দিকে আর গেলাম না, কারণ পরের ষ্টেশনে ফোন করে পাকা খবর নিয়ে তবে অন্য কাজে হাত দেব।

উঠে পড়লাম শ্যামলালের কামরায়। আমাকে দেখে ও খুব অবাক হয়ে গেল। ওর বিস্ময়কে নষ্ট করে দেবার জন্য বললাম—আমার মাথা ধরেছে। তুই মাথাটা একটু টিপে দে।

মাথা টিপতে টিপতে ও বললে—জানো না তো তোমার কি রকম নাম ছড়িয়ে গেছে!

—কি রকম শুনি?

—কালো স্যুট পরা এক ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার কাছে তোমার সম্বন্ধে খবর নিতে। বললেন কোলকাতায় গিয়ে নাকি তোমায় একটা কমপ্লেক্স কেস দেবেন।

ওর ইংরেজী শুনে না হেসে পারা গেল না! ঠাট্টা করে বললাম—তা তুমি যে আমারই দড়ি কলসী সেটা জানলেন কেমন করে উনি? নাকি আজকাল তুমিও আমার মত দরজায় কার্ড ঝুলিয়ে রাখছ?

আমার ঠাট্টা ও বুঝতে পারল না।

বললে—সে রকম বন্দোবস্ত করে দিও তো। আমি যখন তোমার

কামরা থেকে থালা-বাটি নিয়ে চলে আসছি, তখন ও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তোমাদের ঘরের বুড়ি মেমসাহেবের সঙ্গে চুপি-চুপি কথা বলছিল দেখলাম।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

—তাহলে সেই ভদ্রলোকই আমাকে খুঁজছিলেন? কোন দিকে গেলেন বলতে পার?

শ্যামলাল অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন, ও ভদ্রলোক কি আসামী নাকি? ইস্, আগে জানলে ভাল করে দেখে রাখতাম!

—শ্যামলাল, এবার তোমার কাজ হলো সেই ভদ্রলোককে নজর রাখা। ওকে আমার খুব দরকার। কেমন দেখতে?

—বেশ ভালো তো। দেখে বাঙালী বলে মনে হলো না। আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বললেন।

অবাক হয়ে গেলাম—সে কি! ইংরেজী আবার তুই জানিস নাকি? তোর এ বিদ্যের পরিচয় তো পাইনি কোনদিন।

বিরক্ত হলো শ্যামলাল।

বললে—না হয় বিলেতেই যাইনি, কিন্তু তোমার কাছে আছি তো আজ দশ বারো বছর। এটা তো কম নয়।

—তা সত্যি, তোর কাছে কিছুই হার্ড টাস্ক নয়। যাক্, এই ষ্টেশনে আমি নেমে পড়লাম। তুই কিন্তু খেয়াল রাখিস।

॥ আট ॥

হরিনারায়ণজীকে ফোন করতেই উনি বললেন—আপনার অনুমান ঠিক মিঃ চ্যাটার্জী। রবীন্দ্রনাথ কাপুর ভোর ৬টা ১৫ মিনিটের প্লেনে দিল্লী ছাড়বেন। আপনার সাথে এক ট্রেনে চলেছেন ওনার ছোট ভাই অভিরাম কাপুর।

—কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো?

আমি সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বললাম। শুনে উনি লাফিয়ে উঠলেন মনে হলো।

—বলেন কি! লিলি দেবী—দ্যাট অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেডি! ওনার সঙ্গে তো অভিরাম কাপুরের খুব ঘনিষ্ঠতা!

—সে কি! বিস্মিত হলাম আমি।

—হ্যাঁ মিঃ চ্যাটার্জী। দিল্লীর সোসাইটির প্রায় সকলেই এই গোপন ঘনিষ্ঠতার খবর জানেন।

—রবীন্দ্রনাথ কাপুর এ বিষয়ে কিছু জানতেন না?

—বোধ হয় না। কারণ উনি খুব অসামাজিক। তাছাড়া ব্যাঙ্কের কাজের জন্য ওঁকে তো প্রায়ই বাইরে থাকতে হয়।

—অভিরাম লোকটি কেমন?

—খুব একটা খারাপ নয়? তবে চরিত্রকে উনি ঠিক রাখতে পারেননি বোধ হয়। যৌবনে প্রায়ই নারীঘটিত ব্যাপারে ওনাকে জড়িত দেখতাম।

—ওনার নিজের কোন সম্পত্তি আছে কি না জানেন ?

হরিনারায়ণ প্রসাদ বললেন—যতদূর জানি' কিছু নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ কাপুরের আজ যা পয়সা সবই ওনার নিজের উপার্জিত। তবে উনি নিশ্চয়ই অভিরাম কাপুরকে কিছু দিয়ে যাবেন।

আমি হেসে বললাম—কিন্তু নারীঘটিত এত সুনাম। বিশেষ করে লিলি দেবীর যা বর্ণনা দিলেন—এ ব্যাপার শুনলে—

—শুনতে পেলে এবং বিশ্বাস করলে একপয়সাও কাপুর সাহেব দিয়ে যাবেন না ভাইকে। ছেলে এমন কাজ করলে সে শুদ্ধু বয়কট হবে। আর এ তো মশাই বৈমাত্রেয় ভাই। যাক, আপনি কোলকাতায় নেমেই আমাকে ফোন করবেন। আর কাপুরদের মাঝে পড়ে যেন আমার কেসটি মিস্ করে দেবেন না।

শুভরাত্রি জানিয়ে এসে দেখলাম, ট্রেন সবে ছেড়েছে। সামনে একটা সেকেণ্ড ক্লাস পড়ল এবং ছোটাছুটি না করে আমি উঠে পড়লাম সেটাতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তন্দ্রা এসে গেল এবং বাকী রাতটুকু আরামে ঘুমিয়ে কেটে গেল।

ঘুম ভাঙল বর্ধমান ষ্টেশনে।

তখন বেলা ১০টা হবে। নিজের কামরার দিকে অগ্রসর হতেই দেখি সমস্ত ষ্টেশনে কর্মচাঞ্চল্য। খুন হয়েছে ফার্ষ্ট ক্লাসে। ধক্ করে উঠল আমার বুক। আমার কামরায় কিছু হয়নি তো।

দেখলাম, শ্যামলাল ছুটে আসছে। আমায় বললে—সর্বনাশ হয়েছে। শিগগীর এসো। খুন হয়েছে তোমার কামরায়।

ততক্ষণে আমি কামরায় এসে গেছি। যত ভীড় জনতার, তত ভীড় পুলিশের।

বর্ধমান পুলিশ ইন্সপেক্টার পি. কে. সেনকে দেখলাম জনতা নিয়ন্ত্রণ

করছেন। আমার সাথে চোখাচোখি হতে এগিয়ে এসে বললেন—শুনেছেন ব্যাপারটা? এক ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন।

—ও কামরায় আমিই ছিলাম দিল্লী থেকে একমাত্র রিজার্ভড্ যাত্রী। কাল রাতে ট্রাঙ্কল করতে একটা ষ্টেশনে নেমেছিলাম। গাড়ি ছেড়ে দেওয়াতে ও কামরায় আর উঠতে পারিনি। আমি একবার ভেতরে যেতে চাই।

—কি যে বলেন মিঃ চ্যাটার্জী। আপনার জন্য কোন বাধা-নিষেধ নেই। এই পাহারাওয়ালা, দরজা ছেড়ে দাও।

ভেতরে কোন যাত্রী নেই।

আমার জিনিসপত্র আমার সীটের ওপর রয়েছে। দরজার মুখে দু'জন লাল পাগড়ী পাহারা দিচ্ছে।

জানালাগুলি সমস্ত বন্ধ। প্রভাতের উজ্জ্বলতাকে তুচ্ছ করে সমস্ত কামরায় নেমে এসেছে হত্যার কালিমা, আর সেই কালিমা বহন করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন লিলি দেবী গলায় তাঁর গুলি লেগেছে।

এত তাড়াতাড়ি যে এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কাল রাত্রে যদি নিজের কামরায় ফিরে আসতাম তাহলে আততায়ী নিশ্চয় সাহস পেত না। কিন্তু লিলি দেবীকে কে হত্যা করলো? কেন করলো? কি ভাবে করলো?

পুলিশ দু'টির একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—এর সঙ্গে যারা যাত্রী ছিল তারা সব এখন কোথায়।

বিশাল গোঁফ জোড়া পাকাতে পাকাতে বিরক্তির সঙ্গে সে বললে—ওহি তো খুন করিয়েছে বাবু!

কষ্টে হাসি সংবরণ করলাম।

পাহারাওলার মতে দু'একটা খুন হবেই, কিন্তু সেটা কখনই জেনানার ওপর নয়। কথাটা অদ্ভুত বটে।

এস. কে. রায় এসে জানালেন, এবার ট্রেন ছাড়তে তার মিনিট চল্লিশ দেরী হয়েছে। এবারে ট্রেন হয়ত ছাড়বে।

—এ ব্যাপারে আপনিই তো ভারপ্রাপ্ত অফিসার ?

—আপাততঃ তাই মিঃ চ্যাটার্জী। লালবাজারে না যাওয়া পর্যন্ত কেসটা আমার হাতে থাকবে। আপনার কি কিছু জানবার আছে ?

ট্রেনের কিছু ঘটনা বললাম ওনাকে। আর বললাম—আমি হাওড়া স্টেশনে নেমে একবার কাপুর সাহেবের সাথে দেখা করতে চাই। আর দিল্লী থেকে ফার্ষ্ট ক্লাসে কিংবা সেকেণ্ড ক্লাসের রিজার্ভড্ যাত্রীদের মধ্যে কোন কাপুর আছে কিনা এবং থাকলে তার ঠিকানা দেখা দরকার।

এস. কে. রায় বললেন—কোলকাতায় পৌঁছুবার ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আমি আপনাকে খবরটা দেব। এখন আপনি অন্য একটা কামরায় উঠে পড়ুন। ষ্টেশন-মাষ্টার উঠিয়ে দেবেন। আমি আপনার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখুন তো, ভোরবেলাতে একি কাণ্ড! সত্যি, ক্রমে ক্রমেই দেখছি মনুষ্যত্ব লোপ পাচ্ছে মশাই। একজন বৃদ্ধ মহিলা যার কিনা একটা পা ইতিমধ্যেই ওপারের দিকে পড়েছে·····ছিঃ ছিঃ!

এস. কে. রায় চলে গেলেন। ষ্টেশন-মাষ্টার এসে আমাকে খালি একটা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়ে দিলেন। মিঃ রায় এসে চা টোষ্ট দিয়ে গেলেন। লিলি দেবীর প্রাণপাখী হয়ত ছুটে চলল কোন নতুন দেহের খাঁচার সন্ধানে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ি এসে থামল।

এশিয়ার সবচেয়ে বড় ষ্টেশন। লোকজন, আলো, মালপত্রের সমাবেশ। চারিদিক গমগম করছে। কুলীরা ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে ছোটাছুটি সুরু করে দিয়েছে। মনে পড়ল, হাওড়া সম্বন্ধে লিলি দেবীর সেই আগ্রহ।

ট্রেন থেমে পড়তেই আমি ফার্ষ্ট ক্লাস কামরার দিকে এগিয়ে গেলাম। মালপত্র সম্বন্ধে আমার কোন ভাবনাই নেই। সে সব শ্যামলাল নিয়ে ঠিক চলে যাবে।

আমার আগের কামরার সামনে দেখি ইন্সপেক্টর পালিত। ইন্সপেক্টর বোস আরও কয়েকজন পুলিশ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

বর্ধমান থেকে আগেই ফোন করে ওঁদের খবর দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের সঙ্গে তাঁদের নমস্কার বিনিময় হ'লো।

তারপর সেই জায়গাটিতে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

আমি একটু দূরে অপেক্ষা করছি। মিঃ রবীন্দ্রনাথ কাপুরের জন্যে আমার এই অপেক্ষা করা।

লিলি দেবীকে যিনি খবর পাঠিয়েছিলেন তাঁর কথা সত্যি কিনা সেটা আমি যাচাই করছিলাম।

আমার অনুমান সত্যি হ'লো। প্রায় ছ'ফুট লম্বা স্যুট পরা সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোক একটা সৌখীন ছড়ি হাতে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে।

পুলিশ প্রহরীর দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার ইংরাজী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন—এই কামরাতে কি হয়েছে বলতে পারেন? আমার এক আত্মীয়ের আজ দিল্লী থেকে আসার কথা ফার্ষ্ট ক্লাসে।

—লিলি দেবী নামে দিল্লীর এক ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন।

বলে, আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম।

—লিলি চোপরা? ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করেন। তারপর বললেন—নামটা চেনা চেনা ঠেকছে। যাক, ঐ কামরায় আর কোন যাত্রী·····

—আপনি যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন মিঃ রবীন্দ্রনাথ কাপুর, তারা এখন পুলিশের হেপাজতে আছেন।

ভীষণ চমকে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ কাপুর।

তাঁর হাত থেকে ছড়িটা পড়ে গেল। তিনি বললেন—আপনি আমাকে চেনেন? তবে কি আপনিই আমাকে বেনামীতে চিঠি দিয়েছিলেন? কি হ'লো আমার ছেলের? সে কেন পুলিশের হেপাজতে?

ছড়িটা কুড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ কাপুরের হাতে দিয়ে বললাম—উত্তেজিত হবেন না কাপুর সাহেব। আপনাকে বেনামীতে চিঠি কে লিখেছিল জানি না। কিন্তু এটুকু অনুমান করছি, আপনি পিতম কাপুরের পিতা। কারণ আমি ওনার সাথে একই কামরায় দিল্লী থেকে আসছি।

—পিতম কে? আমার তো একটি মাত্র ছেলে—নাম তার পুরন্দর।

—আশ্চর্য হলাম। পিতম নয়!

—আপনার সাথে অযথা কথা বলে সময় নষ্ট করলাম। আচ্ছা নমস্কার। রবীন্দ্রনাথ কাপুর চলে গেলেন।

—শুনুন মিষ্টার কাপুর, আমার নাম ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী। লালবাজারে আমার বাড়ির ঠিকানা পাবেন। প্রয়োজন হলে দেখা করবেন।

—ধন্যবাদ! ভগবান করুন যেন আপনার সাথে না দেখা করতে হয়। ষ্টেশন পা দিতে না দিতেই যা সব অলক্ষুণে কথা শোনালেন! দূর থেকে পরিহাস তরল কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ কাপুরের কথা ভেসে এল।

—আমি এবার ইন্সপেক্টর পালিতের সঙ্গে দেখা করে জানালাম আমার উদ্দেশ্য।

পালিত লোকটি অতি সরল। তিনি কি করে এই সরলতা বজায় রেখেছেন সে এক আশ্চর্যের বিষয়।

আড়ালে লোকে তাঁকে যা-তা বলে। কিন্তু তিনি এসব কথায় কান দেন না।

উনি খুবই মিশুকে লোক। কোন কিছুই গ্রাহ্য করেন না।

—কি সাংঘাতিক আসামী মশায়! শেষকালে একটা বুড়িকে খুন? কি নিয়ে ঘটল ব্যাপারটা?

—আঃ, পালিত! আস্তে কথা বলো। ইন্সপেক্টর বোস বললেন—এই পাহারাওলাকে দিয়ে মিঃ চ্যাটার্জীকে কাপুরদের কাছে পাঠিয়ে দাও।

ইন্সপেক্টর বোস ঠিক কথা বলেছেন পালিত সাহেব। আমি বললাম—আমি তো এখনও কিছুই জানি না। দিল্লী পুলিশের বড়কর্তা মিঃ গুপ্তর বিশেষ অনুরোধ ছিল, এই পার্টির ওপর নজর রাখা। কিন্তু আমার সামান্য ভুলের জন্য এই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

ইন্সপেক্টার বোস মিঃ গুপ্ত সাহেবের নাম শুনে সোজা হয়ে গেলেন। বললেন—মিঃ গুপ্ত না বললেও আমরা আপনাকে অনুরোধ করতাম চ্যাটার্জী সাহেব। আপনার সাহায্যই আমাদের একমাত্র ভরসা। যাক, আপনি বরং এই লক্ষ্মণ সিংএর সাথে কাপুরের কাছে চলে যান।

সামান্য একটু মিথ্যে কেমন করে একটি অসন্তুষ্ট মনের সন্তুষ্টি আনল, ভাবতে ভাবতে আমি আসামী সন্দর্শনে চললাম।

॥ নয় ॥

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পিতম কাপুরের চেহারা বদলে গেছে।

সারা মুখে অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল, আমাদের পায়ের শব্দে সে মুখ তুলে তাকাল।

লক্ষ্য করলাম, এত যন্ত্রণার ছাপ থাকা সত্ত্বেও আমাকে দেখে সে আশ্বস্ত হলো। বললে—নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী। প্রতি মুহূর্তেই ভাবছি এই বুঝি বাবা এসে পড়লেন। বাবা যখন জানতে চাইবেন, কেন লিলি দেবীর মত নোংরা স্ত্রীলোককে খুন করে আমি এত বড় বংশে কালি দিলাম, তখন আমি কি জবাব দেব?

—না, না। তুমি অত কথা বলছ কেন পিতম্? তুমি তো গায়ে হাত দাওনি। তাকে খুন করেছে অন্য কেউ। আর্ত চীৎকার করে উঠল বিমলা।

এতক্ষণ খেয়াল করিনি, এবার দেখলাম ঘরের এক কোণে বিমলা বসে।

লক্ষ্মণ সিং চুপি-চুপি বললে—এই ভদ্রমহিলাকে চলে যেতে বলা হয়েছে। কিন্তু উনি কোলকাতায় এই প্রথম এসেছেন, আর কিছুই চেনেন না বলে কোথাও যেতে চাইছেন না।

আমি পিতম্‌কে বললাম—কোন সাক্ষী-প্রমাণ কি পাওয়া গেছে?

অবসন্ন কণ্ঠে উত্তর দিল পিতম্—একটা পিস্তল পাওয়া গেছে ট্রেনের কামরায়, তার থেকেই গুলি করে লিলি দেবীকে হত্যা করা হয়েছে। আর সেই পিস্তলে আমার হাতের নাকি ছাপ পাওয়া গেছে।

—আপনি কি নির্দোষ? প্রশ্ন করলাম।

—ভগবান সাক্ষী মিঃ চ্যাটার্জী, আমি নির্দোষ। আমি লিলি দেবীকে হত্যা করব একথা ভেবেছি অনেকবার। শেষকালে করতামও। কিন্তু এই খুনটা আমি করিনি। পিতম্ জবাব দিল।

—আপনার এ বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

—বলবার তো অনেক কিছুই আছে মিঃ চ্যাটার্জী, কিন্তু সে কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? পিতম্ বললে—আপনার সাথে সেই ষ্টেশনে কথা বলে গাড়িতে যখন উঠলাম, তারপর তো আপনি জানেন, লিলি দেবীর সাথে কি কথা আমার হয়েছিল। তখন আমি খুব চিন্তায় ছিলাম। তার পরের ষ্টেশনে আপনি নেমে গেলেন আর কালো স্যুট পরা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক লিলি দেবীর সাথে দেখা করতে এলেন। ওনারা করিডরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। আরও কিছু পরে বিমলা আমাকে এক কাপ কফি এনে দিল। ঐ কফি আমাদের কাল হলো মিঃ চ্যাটার্জী। কফিতে নিশ্চয়ই ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

—মিষ্টার কাপুর, আপনি সত্যি বলছেন কিনা—আমি জানি না। কিন্তু আপনি একটা কথা প্রথম থেকেই মিথ্যে বললেন।

—কোন ব্যাপারে মিঃ চ্যাটার্জী ?

—আপনার নাম পুরন্দর কাপুর। তাই না ?

হাসল পিতম্। বললে—আপনার অনুমান ঠিক, আমার এই ছদ্ম-নামের কথা অনেকেই জানত। এই নাম লিলি দেবী আমাকে দিয়েছিলেন।

এবার আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ছেলেটির ওপর আমার বিশ্বাস প্রথম থেকেই ছিল। ওর কেসটি আমি গ্রহণ করলাম।

তাই বিমলা যখন আমাকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললে—মিঃ চ্যাটার্জী, আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন দয়া করে ? আমি তখন বললাম—দয়া করে নয়, আনন্দের সঙ্গে। শুনলাম এইখানে আপনার পরিচিত কেউ নেই। আমাকে এখানে সকলে চেনে। যদি বিবেচনা করেন, আমার সাথে চলুন। কাপুর পরিবারের বধূর কোন অমর্যাদা আমি করব না।

পিতম্ বললে—তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার বিমলা। চ্যাটার্জী সাহেব আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু।

লক্ষ্মণ সিংএর সাথে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা বললাম আমি।

কথা শেষ করে আমি বিমলাকে নিয়ে আমার দিদির বাড়ি পার্ক সার্কাসের দিকে রওনা হলাম।

সারা পথ আমার সাথে বিমলা একটিও কথা বললে না। চুপ করে গাড়ির মধ্যে বসে রইল সে।

তার মনের অবস্থা বুঝে আমিও আর তাকে বিরক্ত করলাম না।

॥ দশ ॥

বিমলা আজ দুদিন হলো আমার দিদির বাড়িতে আছে। বলা বাহুল্য, তাকে পেয়ে এবং এমন ফ্যামিলি পেয়ে উভয়েই সন্তুষ্ট।

মিঃ গুপ্তর কেসটা নিয়ে আমি একটু ব্যস্ত এখন।

দিল্লীতে একটি বড় দল আছে, যারা আন্তর্জাতিক নারী ব্যবসা এবং গোপনে চোরাই সোনার ব্যবসা করে।

দিল্লীর অফিসে হানা দিয়ে বহু কাগজপত্র এবং টাকা উদ্ধার করেছি। তার সঙ্গে খবরও পেয়েছি কোলকাতায় তাদের প্রধান কেন্দ্র, এবং রহস্যের প্রধান নায়ক এসেছে একটা বড় সুযোগের আশায়। তবে এই সুযোগ নারী না টাকা তা অবশ্য এখনও ঠিক ধরতে পারছি না।

মিঃ গুপ্ত প্রতিদিন রাতে একবার করে ট্রাঙ্কল করেন।

ফোন করছে শ্যামলাল। বিমলার সাথে তাকেও আমি দিদির বাড়ি রেখে এসেছিলাম। কারণ শ্যামলালের চেয়ে ভালো পাহারাদার আর কোথায় পাব?

—খোকাবাবু, আজ কাপুর সাহেব না কে একজন বিমলা দিদিকে টেলিফোন করেছিল। ফোনে কথা বলতে বলতে খুব কাঁদছিল। আমি শেষকালে জামাইবাবুকে ডেকে বলে দিতে বললাম তোমার ফোন নম্বরটা।

—ভাল করেছ। তুমিও খেয়াল রাখবে বিমলার সাথে কেউ যেন দেখা না করে, আর আমার বিনা অনুমতিতে ও যেন কোথাও না যায়।

আমি কোথায় খাওয়া-দাওয়া করেছি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করে অতঃপর শ্যামলাল ফোন ছেড়ে দিল। আর আমিও লালবাজারে গাড়ি ঘোরালাম। কারণ জরুরী কথা আছে।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সুধীরবাবু বললেন—১২।.৬ বিডন স্ট্রীটের সুরেন্দর-এর ফ্ল্যাটে প্রায় দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ক ফোন আসে। তাতে নানা রকম কথা শোনা যায়।

আমি বাড়ির নম্বরটা টুকে নিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম। ঠিক করলাম, কাল সকালে ঐ ফ্ল্যাটে হানা দেব।

চাকর এসে কার্ড দিল বাইরের ঘরে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। কার্ড পড়লাম : আর. এন. কাপুর, ব্যাঙ্কার।

ড্রেসটা বদলে নীচে গেলাম।

* * *

আমাকে দেখে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ কাপুর। লক্ষ্য করলাম, প্রথমদিনের সেই সতেজ ভাবটা আর নেই। তবে নিশ্চয়ই পিতমের সাথে দেখা হয়েছে।

আমাকে কথা বলতে হলো না। সোজা এগিয়ে এসে আমার দু'টি হাত ধরে ধরা গলায় বললেন তিনি—আপনার কাছে আবার আসতে হলো মিঃ চ্যাটার্জী। আমার ছেলের কেসের সঠিক অনুসন্ধান করে দিন।

—স্থির হয়ে বসুন মিঃ কাপুর। আপনার সব কথা শুনছি। সত্যের অনুসন্ধান করা আমার পেশা। যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব। আপনি কি ছেলের সাথে দেখা করেছেন ?

—না করলেই ভালো ছিল মিঃ চ্যাটার্জী। ছেলের দেখা না পেয়ে লালবাজারে খবর দিই এবং কাল আমাকে তারা পুরন্দরের সঙ্গে দেখা করিয়ে এনেছে। শুনলাম, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। সে নাকি এক পাঞ্জাবী ভদ্রমহিলার মেয়েকে বিয়ে করে পালিয়ে আসছিল। ভদ্রমহিলা তাকে ফলো করে ঐ ট্রেনেই আসছিলেন। যে ষ্টেশনে আমার সাথে তার দেখা, সেখানেই নাকি ও পিস্তল দিয়ে মহিলাটিকে খুন করে।

একটু থেমে আবার তিনি বললেন—যে ভদ্রলোক পঁচিশ বছর বয়সে

মারা যাবার পর থেকে সমস্ত মেয়েকে মায়ের মর্যাদা দিয়ে এসেছে, তারই একমাত্র সন্তান হয়ে পুরন্দরের একি দুর্মতি।

—প্রথম থেকেই এত ভেঙে পড়বেন না মিঃ কাপুর। আপনার পারিবারিক ইতিহাসটা সংক্ষেপে আমায় বলুন। হয়ত আমার কাজে লাগতে পারে।

মিঃ কাপুর নিজেকে সংযত করে বললেন—আমার পঁচিশ বছর বয়সে একমাত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে স্ত্রী মারা যান। তারপর বিয়ে আর করিনি। ব্যবসা করতে সুরু করি। ছেলে মানুষ হয়েছে আমার দিদির কাছে। পড়াশুনা এবং অন্যান্য ব্যাপারে ও খুব ভাল ছেলে। আমি বিয়ের সব ঠিকঠাক্ করেছিলাম। এমন সময় ছেলে নিখোঁজ। হঠাৎ একটা বেনামী চিঠি পেলাম। তাতে সব পড়ে প্লেনে আমিও চলে এলাম এখানে। উদ্দেশ্য ছিল হাতেনাতে সকলকে ধরব। কিন্তু—

—আপনার পরিবারে লোক ক'জন মিঃ কাপুর?

—আমি ও আমার বাল্য-বিধবা দিদি অচলা, পুরন্দর এবং বৈমাত্রেয় ভাই অভিরাম কাপুর—এই চারজন।

—অভিরাম কাপুর কি আপনার কাছেই মানুষ?

—না, মিঃ চ্যাটার্জী। বছর ছয়েক আগে ও একবস্ত্রে আমার কাছে চলে এসে নিজের দুর্দশার কথা শোনায়। তার ফলে ওকে আমি নিজের কাছে থাকতে বলি। তারপর থেকে ও আমার কাছেই থাকে। আর কি সব কাজ করে তা আমি জানি না। খুব শান্ত। আমি তাই ঠিক করেছি উইলে ওকে কিছু দিয়ে যাব। আর বাকি সব দান করব এক মিশনে।

—আমার স্থির বিশ্বাস মিঃ কাপুর, পুরন্দর খুন করেনি। ওর পেছনে একটা দল আছে যারা নানা রকম কায়দা করে ওকে ফাঁসিয়েছে। আর যে মেয়েটিকে পুরন্দর বিয়ে করেছে, তার মত সুন্দরী আমি খুব কম

দেখেছি। যদি আমাকে বিশ্বাস করেন তবে একদিন ওর সঙ্গে দেখা করুন। যদি পছন্দ না হয় তাহলে তো কথাই নেই। তবে আমার ধারণা, আপনার পছন্দ হবেই। পদ্ম তো পাঁকেই জন্মে মিঃ কাপুর।

কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলেন রবীন্দ্রনাথ কাপুর।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বেশ, যখন আপনি বলছেন, যাবো। ঠিকানা দিন। আমাদের জাতের মেয়েদের আপনি চেনেন না মিঃ চ্যাটার্জী, তাই অত সার্টিফিকেট দিচ্ছেন।

আমি হেসে ঠিকানা দিয়ে বললাম—দেখা যাক।

মিঃ কাপুর চলে গেলেন।

॥ এগারো ॥

লালবাজারে খবর নিয়ে জানলাম, মিঃ গুপ্তর কেসটা ক্রমশঃই জটিল হয়ে যাচ্ছে। নারী এবং টাকা কোনটাই বাকি নেই। সব রীতিমত পাচার হয়ে যাচ্ছে।

রাত আন্দাজ ১১টা হবে। আমি বিডন স্ট্রিটের দিকে রওনা হলাম।

ছোট্ট বাড়ি।

সামনে লোহার রেলিং লাগান। দরজায় একটা ছোট নেম-প্লেট :

অনিল ব্যানার্জী, এ্যাডভোকেট, কলিকাতা।

মুখে নামটা দু'বার পড়ে মনের খাতায় লিখে নিলাম। বাড়িতে কোথাও আলো নেই।

কোন রাস্তা দিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করব ভাবছি, এমন সময় একটা ছোট চকোলেট রঙের ফোর্ড গাড়ি দরজার সামনে দাঁড়াল।

মুখে গোঁফ-দাড়ি। পরণে কালো স্যুট। মাথায় সাদা পাগড়ি। একজন মধ্যবয়সী লোক চাবি বের করে দরজা খুলে ভেতরে চলে গেলেন।

মিনিট খানেকের মধ্যে এস্প্ল্যানেডের দিকে চকোলেট রঙের ফোর্ড গাড়িটা ছুটে চলল।

এক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম। আমার অষ্টিন গাড়িও সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট নিল ঐ ফোর্ড গাড়িকে ধরবার জন্যে।

নজর করে যেতে যেতে চোখে পড়ল, দূরে একটি হোটেলের সামনে চকোলেট রঙের গাড়িটা পার্ক করা। ঐ শিখ ভদ্রলোক ঝোলান সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

আমি গাড়ির মধ্যে বসে আমার ছদ্মবেশের বাক্স খুললাম। তারপর হোটেলের ঝোলান সিঁড়ি দিয়ে যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম—তখন আমাকে দীপক চাটার্জী বলে চেনা যায় না কিছুতেই।

হলঘরে বেশী লোক নেই।

আমি সেই অজানা শিখের সামনের টেবিল দখল করলাম এবং তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিশ্রীভাবে হাত-পা নেড়ে বয়কে ডাকতে লাগলাম।

বয়ের আসতে মিনিট দুই তিন দেরী হতে, আমি একটা অশ্লীল হিন্দী গালাগালি দিলাম, এবং ইংরেজীতে বললাম—আমার দেশ হ'লে কোন লোককে এতক্ষণ টেবিলে বসে থাকতে হয় না।

পকেট থেকে মানি-ব্যাগটা বের করতে গেলাম আর আমার রঙ

ঢঙে রুমালটা পড়ে গেল। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম না। কারণ আমি তখন টাকা গুণতে ব্যস্ত।

উদ্দেশ্য সফল হলো। টেবিলের সীটের ভদ্রলোক এগিয়ে এসে রুমালটা তুলে দিলেন।

আমি তাঁকে প্রতিদানে আমার সীটে বসতে বললাম।

একটু ইতস্ততঃ করে ভদ্রলোক বসলেন।

তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বুকটা দুরু-দুরু করে উঠল। কি অতল-স্পর্শী দৃষ্টি। এর একমাত্র তুলনা মেলে শিকারী বাঘের চোখে। তবে আমার মনে হ'লো, এ দুটি চোখ যেন আমি আগে কোথায় দেখেছি।

—কোথায় থাকেন আপনি? ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

—মিশরের নাম শুনেছেন? সুয়েজ—খাল? আমি থাকি সেই দেশে, কায়রোতে।

—কায়রো? ভদ্রলোক অবাক হয়ে হয়ে গেলেন।

—কেন, আপনি গেছেন নাকি? জড়িয়ে জড়িয়ে বললাম।

—না, যাইনি তবে শিগ্‌গীরই যাবো।

—কিসে যাবেন? প্লেনে, না—জাহাজে?

—থতমত খেয়ে ভদ্রলোক বললেন—কেন? এ প্রশ্ন কেন?

—আর কেন? তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমি বললাম—জাহাজ হলে আমি যেতাম আপনার সঙ্গে। আপনাকে আমায় পছন্দ হলো কিনা। তা যাক গে মশাই। এখন দরকার মত বস্তুটি পাওয়া যাবে তো, আর তার সাথে—চোখের ইঙ্গিতে বাকি কথা সারলাম।

খুব খুশী হলেন ভদ্রলোক। বললেন—নিশ্চয়ই। তবে টাকা লাগবে। এ হোটেলের মালিক আমার চেনা।

—কত টাকা? পাঁচ হাজার? দশ হাজার? আমি বলি।

উত্তেজনায় চোখ দুটো বড় দেখায় ভদ্রলোকের।

—অতো লাগবে না। তবে চিরদিনের মত যদি কাউকে চান তো সে বন্দোবস্ত করে দেব।

এবার আমি লাফিয়ে উঠলাম—সে কেমন মশাই? আকাশের চাঁদ তো? দরকার পড়লে বিশ হাজারও দেব তাহলে।

—আকাশের চাঁদও তার কাছে মিটমিটে মশাই। তার ওপর শিক্ষিতা। তবে টাকাটা আমাকে ক্যাশ দিতে হবে, আর পরের দায়িত্ব সব আপনার?

ভদ্রলোক বলে চললেন—পুলিশ পেছনে লেগেছে। আমিও কয়েক দিনের মধ্যে কাটব। যাবার আগে এই দিকটা ম্যানেজ কি ক'রে করব তাই ভাবছিলাম। আপনার সাথে দেখা হ'য়ে ভালোই হ'লো। আমিও কায়রো যাচ্ছি।

আমার মাথাটা টেবিলের ওপর ঢুলে ঢুলে পড়ছিল। কোনমতে সোজা করে বললাম—বেশ, কোথায় দেখব বলুন? বিশ হাজার টাকা আমার সঙ্গেই থাকে। পছন্দ হ'লে হাতে হাতে টাকা।

একটা বয় এসে ওর কানে কানে কি বললে, শুনে তিনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়লেন। বললেন—শনিবার দিন বিকেল ছ'টার সময় আপনি এই হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াবেন। ঐ দিনই কায়রো চলে যাচ্ছি।

—চল্‌লেন নাকি? আমি বললাম।

—হ্যাঁ, মশাই। খবর পেলাম টিকটিকিরা আসছে এদিকে।

একটা কেবিনে ঢুকে পড়লেন তিনি।

* * *

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্সপেক্টর দাসগুপ্ত চারজন সাদা পোষাকে পুলিশ নিয়ে প্রবেশ করলেন।

প্রতিটি টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখে রুমাল দিয়ে যেভাবে

তিনি চললেন, দেখে মনে হবে, হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি গঙ্গাস্নান করলে তবেই পবিত্র হবেন।

পকেট থেকে নিজের নাম-লেখা কার্ড বের করে তার উলটো পিঠে পরিষ্কার বাংলাতে লিখে দিলাম সেই শিখ ভদ্রলোকের ওই কেবিনটার কথা। এদের সার্চ করতেও অনুরোধ করলাম তাঁকে।

তারপর সুরু হলো আমার টেবিল ঠুকে গান আর বিশ্রীভাবে হাত-পা নেড়ে নাচ। যে কয়েকজন হলে ছিলেন তারা সকলেই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন। এক মাতালের ওপর প্রতিটি মাতালের দরদের কথা প্রায় উপকারের মত কিনা।

নাক-মুখ সিঁটকে ইন্সপেক্টর দাসগুপ্ত আমার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমিও পকেট থেকে কার্ডটা বার করে ওর হাতে গুঁজে দিলাম।

এক পলকে কার্ডটা পড়ে ধাতস্থ হয়ে ছুটলেন ম্যানেজারের ঘর লক্ষ্য করে।

আমিও উপস্থিত সকলের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে আস্তে আস্তে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কারণ ওখানে আমার আর করণীয় কিছু ছিল না।

॥ বারো ॥

পুরন্দর কাপুরের কেসটা কোর্টে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ কাপুর ও বিমলা এসেছিলেন আমার কাছে।

আমি বললাম—দাশগুপ্ত তো খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে ঐ শিখ ভদ্র-

লোকই সুরেন্দ্র সিং। যতদূর সম্ভব মনে হয় কোলকাতা ঘাঁটির ও-ই বড়কর্তা। শুক্রবার বিকেলেই ওকে ধরব। তারপর ধরতে হবে কে এই রহস্যের নায়ক।

আমাদের কি হবে চ্যাটার্জী সাহেব? রবীন্দ্রনাথ কাপুর প্রশ্ন করলেন।

—ধৈর্যহারা হবেন না কাপুর সাহেব। সুরেন্দর সিংকে আগে ধরি। ওর একটা কথায় আমি খুব চিন্তিত। নারীঘটিত ব্যবসা যে এরা করে তা আমরা জানি, তবে হঠাৎ কেন সুন্দরী মেয়ে ও আমাকে সাপ্লাই দিতে চায়, তা বুঝতে পারছি না। কাপুর সাহেব, বিমলার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। দুনিয়াতে কারোর অসাধ্য কিছু নেই।

বিমলাকে কাপুর সাহেব নিজের কাছে নিয়ে রেখেছেন।

পুত্রবধূর মর্যাদা এবং মেয়ের ভালবাসা দুই-ই তাকে দিচ্ছেন।

আমার কথা শুনে চিন্তিত হলেন।

—আপনি এক কাজ করুন মিঃ কাপুর। আপনার ভাই অভিরাম কাপুরকে ট্রাঙ্কল করে কোলকাতায় আনিয়ে নিন। আমি বললাম—বলা যায় না তো, কত কি দরকার হতে পারে। বিশেষ করে আপনি যখন দিল্লী সমাজ সম্পর্কে কিছু জানেন না। তাছাড়া মিসেস্ কাপুরকেও চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেওয়া যাবে।

—কথাটা আপনি খারাপ বলেননি চ্যাটার্জী সাহেব। আমি আজই ফোন করে দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ কাপুর বললেন।

ওঁরা চলে যাবার কিছু পরে বেয়ারা এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল।

পরিষ্কার সাদা কাগজে টাইপ করে ইংরেজীতে লেখা :

প্রিয় মিঃ চ্যাটার্জী,

আমাকে ধরবার চেষ্টা করবেন না। তাতে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে।

ইতি—**জনৈক বন্ধু।**

চিঠিখানা পড়ে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে অ্যাডভোকেট অনিল ব্যানার্জীকে ফোন করলাম।

একটু পরে ফোনে ভেসে এল গম্ভীর কণ্ঠ—হ্যালো!

—আপনি কে?

—আমি অনিল ব্যানার্জী কথা বলছি।

—নমস্কার। আমি পুলিশের তরফ থেকে কয়েকটি বিষয়ে অনুসন্ধান করছি। এই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। তাই আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।

—আপনার নাম?

—আমার নাম দীপক চ্যাটার্জী। প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

—ও, নমস্কার। আপনার নাম শুনেছি।

—শুনে সুখী হলাম।

—কি বিষয়ে আপনি জানতে চান বলুন?

—আপনার বিডন স্ট্রীটের বাড়িটা কি সবটা ভাড়া দিয়েছেন?

—হ্যাঁ। দিল্লীর এক ভদ্রলোক মাসিক চারশো টাকা ভাড়ায় বাড়িটা চার বছরের জন্যে লীজ নিয়েছেন।

—প্রতি মাসেই কি আপনি নিয়মিত ভাড়া পান?

—প্রতি মাসের পয়লা তারিখে তিনি নিয়মিত ভাড়া মনি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দেন।

—ভদ্রলোকের নাম?

—মুকুন্দলাল।

—তাঁর সম্বন্ধে কি আর কিছু জানেন?

—না। এমন কি, তিনি কখন এখানে থাকেন বা না-থাকেন তাও জানতে পারি না।

—আশ্চর্য তো!

—হ্যাঁ, ভদ্রলোককে সত্যি একটু রহস্যময় বলে মনে হয় আমার। তবে নিয়মিত ভাড়া পাই বলে আমি ও নিয়ে আর মাথা ঘামাই না।

আমি বুঝতে পারলাম যে তাঁর কাছ থেকে আর কিছু জানা যাবে না। অগত্যা রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

* * *

তারপর আমি ছুটলাম রবীন্দ্রনাথ কাপুরের হোটেলের অভিমুখে।

আমাকে দেখে রবীন্দ্রনাথ কাপুর হাসতে হাসতে বললেন—বিমলা মা সবেমাত্র চায়ের অর্ডার দিয়েছে, আর এমন সময় আপনি হাজির! আপনি কি জ্যোতিষ-বিদ্যাও জানেন নাকি মিঃ চ্যাটার্জী?

বিমলা মুখ লুকিয়ে হাসল।

ওর দিকে চেয়ে আমি বললাম—আচ্ছা কাপুর সাহেব, মুকুন্দলাল নামে কোন ভদ্রলোককে আপনি চেনেন?

আর্তনাদ করে উঠল বিমলা—কেন? তিনি কি করেছেন? ঐ ভদ্রলোকই যে আমার বাবা।

আমার কথার ইঙ্গিত ধরতে পেরেছিল মিঃ কাপুর, তাই বিমলার কথা শুনে বেদনায় ভরে গেল তাঁর মুখ।

এত বড় বংশের একমাত্র পুত্রবধূ, কিন্তু কি ঘৃণিত তার পিতামাতার পরিচয়! সহ্যের সীমা বুঝি আর থাকে না।

বিমলাকে বললাম—ওঁকে ট্রাঙ্কল করবার যদি সুবিধা থাকে, তবে আজই আপনি কোলকাতায় আসতে বলে দিন। পুরুন্দরের কেস সম্বন্ধে অনেক খবর আমরা পেতে পারি।

—আমি এখনই ফোন করে দিচ্ছি। যদি বাবাকে পেয়ে যাই তবে সকালের প্লেনে চলে আসতে পারবেন।

তারপর মিঃ কাপুরের পাংশু মুখের দিকে চেয়ে আমাকে ধরা গলায় বললে—আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না চ্যাটার্জী সাহেব,

কিন্তু সত্যি বলছি, আমার বাবা নিরপরাধ। চিরদিন তিনি মায়ের সমস্ত কাজের প্রতিবাদ করে এসেছেন এবং কেবলমাত্র ওঁর চেষ্টাতেই আমি ছোটবেলা থেকেই বাড়ির দূষিত হাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে স্কুল, বোর্ডিং, কলেজে দিন কাটিয়েছি। শেষ অবধি মায়ের প্রভাব থেকে কতটা দূরে থাকতে পারতাম জানি না। তবে ভগবান যে আজও আছেন তারই প্রমাণস্বরূপ পুরন্দর এসে দাঁড়াল আমার জীবনে। আজ পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি, প্রভু, পুরন্দরের প্রাণভিক্ষা দাও। প্রতিদানে যদি আমার প্রাণ দিতে হয় আমি সানন্দে রাজী আছি। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভেঙে পড়ল বিমলা।

—মা বিমলা, কাঁদাকাটা ক'রো না। কোন ভাল জিনিস পেতে হলে কিছু ত্যাগ করতে হয়। তোমারও হয়ত সেই পরীক্ষার দিন এসেছে। চল, আমরা অভিরাম ও তোমার বাবাকে ফোন করে আসি। নিজের বেদনা ভুলে, মিঃ কাপুর বিমলাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

—হ্যাঁ, আর দেরী নয় মিঃ কাপুর। হাতে আর মাত্র একটা দিন সময় আছে।

আমি চলে এলাম বিদায় নিয়ে।

॥ তেরো ॥

সেদিন শুক্রবার ছিল।

আজ সকালের প্লেনে মুকুন্দলালের আসার কথা। অভিরামকে ফোনে পাওয়া যায়নি এবং তার প্রয়োজন গুরুতর নয় বলে তাকে আর ফোন করাও হয়নি।

সকালের চা পান করে কয়েকটি ব্যাপারে লালবাজারে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কোজী হোটেল হয়ে ফিরতে আমার ঘণ্টাখানেক দেরী হয়েছিল। বাড়ি ফিরে শুনলাম, জরুরী ফোন এসেছিল লালবাজার থেকে ও দমদম এয়ারপোর্ট থেকে।

এয়ারপোর্টের এনকোয়ারীতে ফোন করতেই ওখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমার পরিচয় নিয়ে বললেন আমাকে চলে আসতে। কারণ, একটা হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এয়ারপোর্ট ক্যান্টিনে এবং যাকে খুন করা হয়েছে তার নাম মুকুন্দলাল।

মুকুন্দলাল! বিমলার বাবা?

আমি দেরী না করে এয়ারপোর্টে রওনা হলাম। আমার চিন্তাধারা যে অভ্রান্ত নয় তারই প্রমাণ মুকুন্দলালের মৃত্যু। প্রকৃত অপরাধী আমার নাগালের বাইরে।

তবে একটা কথা বোঝা গেল, বিমলার বাবা সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন না, এবং সেইজন্য হয়ত তিনি আসার সময় তাঁর কোন ঐ জাতীয় বন্ধুকে ফোন করে জানিয়েছিলেন। ক্যান্টিনে চা খেতে খেতে হয়ত কোন আলোচনা হয়েছিল এবং হয়ত মেয়ের স্বার্থের প্রতিকূলে কোন কাজ তিনি করতে চাননি, ফলে আততায়ী চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কিন্তু বিমলা এবং মিঃ কাপুরের দৃষ্টি এড়িয়ে, মুকুন্দলাল গেলেন কি করে আততায়ীর কাছে? মিঃ কাপুর কি মুকুন্দলালকে রিসিভ করতে যাননি?

এয়ারপোর্টের শান্ত সৌন্দর্য মুকুন্দলালের মৃত্যুতে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। এই বিশাল পৃথিবী কারুর তোয়াক্কা রাখে না। যথারীতি চলে তার কাজ।

মিঃ কাপুর বিমলাকে ধরে ধরে গাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল বিমলা—চ্যাটার্জী সাহেব, এখনও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? মা গেলেন, বাবা গেলেন, আর কাকে নিয়ে ভগবান আমায় শাস্তি দেবেন?

আমি চোখের ইশারা করে কাপুর সাহেবকে বললাম বিমলাকে নিয়ে যেতে।

ওঁকে পরে ফোন করব তাও বলে দিলাম—তারপর বিমলাকে সান্ত্বনা জানিয়ে এনকোয়ারীর দিকে রওনা হলাম।

মুকুন্দলালকে সুশ্রী বলা চলে না, তবে পোষাক-পরিচ্ছদ মন্দ নয়।

জীবনের অশ্বস্তিকর ক্লান্তি চোখের কোণে কালি হ'য়ে জমে আছে।

দাসগুপ্ত বললেন—যে প্লেনে মুকুন্দলাল এসেছিলেন সেটা সময়ের পনেরো মিনিট আগে আসে। সম্ভবতঃ ছদ্মবেশে আততায়ী অপেক্ষা করছিল, ওঁকে নিয়ে ক্যান্টিনে চা খেতে যায়। তারপর কখন ওঁর পেয়ালাতে বিষের পুরিয়া দিয়ে দেয়। যে চা সার্ভ করছিল ওঁদের টেবিলে, সে বলেছে—বাবু যখন টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন, তখন দ্বিতীয় বাবু বয়কে বলেছিল, এর মাথা ধরেছে, আমি ওষুধ আনতে যাচ্ছি। চায়ের দাম বাবদ পাঁচ টাকার নোট দিয়ে গিয়েছিল। দশ মিনিট পরে ও যখন দেখলো দ্বিতীয় বাবু ফেরেনি, তখন সে ভাঙানি দিতে গিয়ে প্রথম বাবুকে ডাকতে গিয়ে দেখে—তিনি মৃত।

—আপনি লোকটার যে বর্ণনা দিলেন মিঃ দাসগুপ্ত, তাতে সুরেন্দর বলেই মনে হচ্ছে। উঃ, কি সাহস! প্রকাশ্য দিবালোকে এ কাজ করল? যা হোক, লাশ মর্গে পাঠিয়ে দিন। আজ বিকেলের কথা মনে আছে তো?

—বিকেল পাঁচটা থেকে আপনারা হাজির থাকবেন। আমি ওর হাতে নকল টাকার বাণ্ডিল তুলে দিলেই আপনি সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেষ্ট করবেন। খুব সাবধান! লোকটা ভীষণ ধড়িবাজ।

* * *

বিকেল পাঁচটার সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

আওয়াজটা শুভ বলে মনে হ'লো না। ফোন ধরতেই ওপার থেকে

রবীন্দ্রনাথ কাপুরের কণ্ঠ কানে এল—মিঃ ব্যানার্জী, আজ কিছুক্ষণ থেকে বিমলাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কি করব ?

আমি বললাম—ওর পাপের বোঝা পূর্ণ হয়েছে। আপনি শিগগীর এস্‌প্লানেডে কোজী হোটেলে চলে যান এবং ইন্সপেক্টর দাসগুপ্তের কাছ থেকে কি করতে হবে জেনে নেবেন। ভয় নেই, বিমলাকে আজই পাওয়া যাবে।

* * *

কাঁটায় কাঁটায় বিকেল পাঁচটায় গাড়িটা এসে দাঁড়াল কোজী হোটেলের সামনে। দেখলাম, চালকের আসনে আর একজন বসে। গাড়ির ষ্টার্ট বন্ধ হলো। পাশের দরজা থেকে একলাফে সুরেন্দর সিং নেমে এল। আমাকে আদাব জানিয়ে সে একটা বড় ছবি আমার হাতে তুলে দিল। অপূর্ব সুন্দরী এক নারীমূর্তি। কোন সন্দেহই নেই যে, সে ছবি রবীন্দ্রনাথ কাপুরের পুত্রবধূ বিমলার।

—এই দেখুন কেমন মেয়ে। সুন্দর নয় ? কথাবার্তা আরো ভালো খাঁ সাহেব। একি! আপনার তো সেদিন দাড়ি দেখেছিলাম। আজ কোন চিহ্ন দেখছি না কেন ? তবে—তবে কি—

এক সেকেণ্ডের মধ্যে আমার হাত থেকে ছবিটা কেড়ে নিয়ে সুরেন্দর সিং গাড়িতে গিয়ে উঠল, আর আমিও উপায় না দেখে চীৎকার করে উঠলাম—আসামী পালাচ্ছে! পুলিশ! পুলিশ!

দুজন পুলিশ ছুটে আসছিল। তাদের দিকে ফাঁকা ফায়ারিং করে তীরের মত ছুটে গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

সামান্য ভুলে ব্যাপারটা গেল উল্টে। একটা তুচ্ছ দাড়ি। হায় হায়!

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে হতবাক।

আমি বললাম—ওকে এক্ষুণি ধরা প্রয়োজন, কারণ ও আজই কায়রো পালাচ্ছে। সঙ্গে বিমলাকে নিয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু যাচ্ছে কিসে? প্লেনে, না—জাহাজে?

গাড়িতে উঠে পড়লাম। উঠে বললাম—চলুন অনিল ব্যানার্জীর বাড়ীতে, সেখানেই সুরেন্দর থাকে।

দরজার তালা ভাঙা হ'লো।

পুলিশের দল চারদিকে আঁতি-পাতি করে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ আমার হাতে এল কাগজ। একপিঠে কি সব হিসেব লেখা। আর অপর পিঠে উড়োজাহাজ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন।

চীৎকার করে উঠলাম—চলুন সকলে এয়ারপোর্টে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও প্লেনে যাচ্ছে।

লালবাজার থেকে একটি দলকে ইন্সপেক্টর পালিতের নেতৃত্বে পাঠান হ'লো খিদিরপুর পোর্ট পুলিশ অফিসার মিঃ ঘোষের কাছে। আমরা ছুটলাম এয়ারপোর্ট অভিমুখে।

* * *

প্লেন আসতে তখনও মিনিট দশেক বাকী যাত্রীরা সব কাষ্টমে।

অনুসন্ধান করে যাত্রী-তালিকায় সুরেন্দর সিংএর নাম পাওয়া গেল না। যে কয়েকজন মহিলা যাত্রী আছেন সকলেই স্বামীসহ।

—আমি জানতাম ও নিজের নামে যাবে না।

—আমার আর ধৈর্য থাকছে না মিঃ চ্যাটার্জী। মনে হচ্ছে, এখুনি লোকটাকে—দাঁত কড়মড় করে উঠলেন দাসগুপ্ত।

প্রথম ঘোষণা সুরু হয়ে গেল। যাত্রীরা দাঁড়ালেন। যাওয়া সুরু হয়ে গেল।

দ্বিতীয় ঘোষণা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠেলন দাস-গুপ্ত—ঐ তো আমাদের আসামী! পুলিশ—পুলিশ—পুলিশ!

এবার আর পুলিশের ক্ষিপ্রতা ব্যর্থ হলো না। সকলের সহযোগিতায় ধরা পড়ল সুরেন্দর সিং।

—আমার বিমলা মা কোথায় মিঃ চ্যাটার্জী? রবীন্দ্রনাথ কাপুর বললেন।

—যিনি বোরখা পরে দূরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অনুমান করছি, তিনিই বিমলা। কোন কড়া রকমের মরফিয়া ইঞ্জেকশনে বেচারী আচ্ছন্ন। মিঃ দাসগুপ্ত, আপনি গিয়ে ওর ঢাকা খুলে দিন।

—তা যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে মহাপ্রভুকে একবার ভাল করে দর্শন করে যাব না? সুরেন্দর সিংকে হাতকড়া লাগিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করলে দাসগুপ্ত।

—প্লেনের লিষ্টে তো ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছে। বলি, এই নামটাও ছদ্ম নয় তো? আর পোষাক-পরিচ্ছদ?

দাড়ি ধরে এক টান দিলেন দাসগুপ্ত। আর তখনই ঘটে গেল একটা অদ্ভুত পরিবর্তন।

দাড়ি, গোঁফ, গালপাট্টা সব একে একে খুলে গেল।

বিস্ময়ে যেন আর্তনাদ করে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ কাপুর। —একি মিষ্টার চ্যাটার্জী! এই সমস্ত কাণ্ডের নায়ক আমারই ভাই অভিরাম?

দীপক বললো—হ্যাঁ। শুধু তাই নয়। এই অভিরাম কে জানেন?

—কে?

—এ হলো ভারত বিখ্যাত ক্রিমিন্যাল—দস্যু-দলপতি বীরভদ্র।

—দস্যু বীরভদ্র!

—হ্যাঁ।

সবাই অবাক। একি অবিশ্বাস্য ঘটনা-চক্র!

॥ চৌদ্দ ॥

লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের একটি কক্ষ।

পুরন্দর ছাড়া পেয়ে দেখা করতে এসেছিল তাঁর ওপরওয়ালা অফিসারদের সঙ্গে।

সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ কাপুর, বিমলা, আমি (দীপক চ্যাটার্জী) আর ইন্সপেক্টর মিঃ দাসগুপ্ত।

ওরা আজ যাবে গয়াতে বিমলার বাবা-মায়ের শ্রাদ্ধাদির জন্যে। তারপর যাবে দিল্লী।

সবাই আমাকে বললে—মিঃ চ্যাটার্জী, এই কেসটার ঘটনাগুলো একটু বুঝিয়ে বলুন।

আমি বলতে লাগলাম :

যৌবনেই অভিরাম অসৎসঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। পার্থিব সুখ ভোগের জন্যে লালায়িত হয়। কিন্তু তার জন্যে চাই টাকা। সে টাকা সহজে উপায় করা যায় অন্য পথে। তাই সেই পথ ধরল সে।

দেখতে দেখতে বিরাট একটা দলের সে দলপতি হয়ে বসল।

সারা ভারতের অপরাধ-জগতের মুকুটমণি হয়ে পড়ল। নাম নিল—বীরভদ্র। তবে থাকত খুব গোপনে, কেউ তাকে চিনত না।

প্রথমে হীরার লকেটের ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার সংঘর্ষ হয়। তার

নাম না জানলেও তার আকৃতি, কণ্ঠস্বর, হাতের লেখা সব জানতে পারি আমি।

ওই সময়েই লিলি দেবীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। তাঁর মেয়েটিকে তিনি দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল একটা ষড়যন্ত্র।

লিলি দেবীর রাগ ছিল রবীন্দ্রনাথের উপরে। কারণ তাঁর পার্শোন্যাল কিছু টাকা ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় তাঁর টাকাটা মার যায়।

অভিরামের পরামর্শে পুরন্দরের সঙ্গে দেখা বিমলার।

সেই সময়ে ঘটল একটা ঘটনা।

অতএব তীর-নিক্ষেপ ব্যর্থ হলো না।

রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে হয়ে গেল। বেনামীতে সেটা অভিরাম জানিয়ে দিল রবীন্দ্রনাথকে।

এই ষড়যন্ত্রের কথা কিন্তু পুরন্দর বা বিমলা কেউ জানত না।

ট্রেনের কামরায় কফিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল অভিরাম। ওরা যখন কফি খেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, তখন সাইলেন্সারযুক্ত পিস্তল দিয়ে লিলি দেবীকে হত্যা করে সে। তারপর পিস্তলটা পুরন্দরের হাতে গুঁজে দিয়ে পালিয়ে যায়।

অভিরাম নিজের প্ল্যান অনুযায়ী বিমলাকেও সরাতে চেয়েছিল। তার মতলব ছিল অন্য—সম্পত্তি হাত করা। কিন্তু আমি এসে পড়লাম মাঝখানে। তাই সব গোলমাল হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের সম্পত্তির ওয়ারিশন হওয়া গেল না।

মুকুন্দলালকেও হত্যা করেছিল অভিরাম। তার কারণ, তিনি প্রথমে হাত মিলিয়ে চললেও পরে আর রাজী হননি।

বোধহয় নিজের মেয়েকে তিনি ভালবাসতেন। তার ভবিষ্যৎ ভেবেই তিনি ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে চাইলেন না।

—উঃ, এত সব ঘটেছে! ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। বললেন রবীন্দ্রনাথ।

তারপর বললেন—আমার ভাই হয়ে, এত বড় বংশের ছেলে হয়ে, তার এই মতি? ছিঃ ছিঃ! ভাবতেও লজ্জা করে। ওকে নিয়ে আপনারা যা খুশী করুন, আমি কোন আপত্তি করব না।

বলে, তিনি একটা চেক লিখে তা তুলে দিলেন আমার হাতে।

দেখলাম, সেটা পাঁচ হাজার টাকার চেক।

তারপর বললেন—সত্যি, আপনি মহৎ কাজ করেছেন দীপকবাবু! আপনাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমি বললাম—আবার চেক কেন?

—শুধু আমি নই, বিমলা আর পুরন্দরও আমাকে বার-বার অনুরোধ করেছে টাকাটা দিতে।

বিমলার উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলতে পারলাম না আমি।

* * *

একমাস পরে।

একটি বিয়ের কার্ড পেলাম।

আগেই পুরন্দর আর বিমলার বিয়ে হয়েছিল রেজিস্ট্রি করে।

এবারে রবীন্দ্রনাথ কাপুর একটা উৎসবের ব্যবস্থা করেছেন।

তাতে আমাকে, মিঃ গুপ্তকে, আরও অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি।

নিমন্ত্রণ-পত্রটা পেয়ে অসীম আনন্দে মন যেন ভরে উঠল।

॥ সমাপ্ত ॥